দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

চাটুকার সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করছে — পৃঃ ১৩

ইউপিএ আমলে গ্রেপ্তারের সময় যাঁরা মুখ খোলেননি তাঁরাই আজ মুখর কেন? —পৃঃ ২৩

৭১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮।। ৩১ ভাদ্র - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

শহুরে নকশাল নকশালের চেয়েও ভয়ঙ্কর

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ৩১ ভাদ্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৭ সেপ্টেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

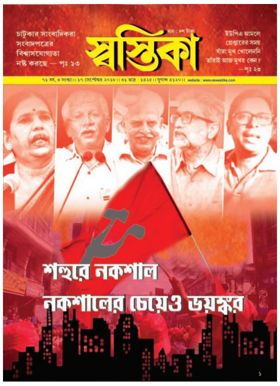

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

বিহারিদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া দিদির নয়া ড্রামাবাজি
□ গূঢ়পুরুষ □ ৬

খোলা চিঠি : সিটি অফ জয় □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

জি এস টি এবং বিমুদ্রীকরণে ভারতের অর্থনীতি বৃদ্ধির নতুন শিখরে □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ৮

ওঁরা আসলে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে
□ ড. জিষ্ণু বসু □ ১০

চাটুকার সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করছে
□ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১৩

বাজারি কলমবাজদের মতে পরকীয়া অপরাধ নয়
□ নরেন্দ্রনাথ মাহাতো □ ১৫

বাঙ্গালি বলতে কাদের বোঝায় : একটি সাম্প্রতিক বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালির পরিচয় নির্ধারণ □ নীল ব্যানার্জি □ ১৭

ইউপিএ আমলে গ্রেপ্তারের সময় যাঁরা মুখ খোলেননি, তাঁরাই আজ মুখর কেন □ দীপক কুমার ঘোষ □ ২৩

শহুরে নকশাল নকশালের চেয়েও ভয়ঙ্কর
□ দেবাশিস আইয়ার □ ২৬

বেদের বিশ্বস্রষ্টা আজ শুধুই যন্ত্রের দেবতা
□ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

নারকেল সংস্কৃতি ও ভারতীয় ঐতিহ্য
□ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৩

ভূদেববন্ধু রাজনারায়ণ □ বিজয় আঢ্য □ ৩৫

গল্প : দূরবর্তিনী □ রূপশ্রী দত্ত □ ৩৭

মারণরোগ ডেঙ্গুজ্বর এবং বঙ্গদেশেরই বিস্মৃতপ্রায় এক অতীত
□ দেবীপ্রসাদ রায় □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □
সমাবেশ-সমাচার : ২৯-৩০ □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □
চিত্রকথা : ৪০ □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪১**□ **মঙ্গলনিধি : ৪২**
□ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

আগামী ১ অক্টোবর পূজা সংখ্যা। তাই ১লা অক্টোবর সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ৮ ও ১৫ অক্টোবর স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে। পূজাবকাশের জন্য ২২ ও ২৯ অক্টোবর স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে না। ৫ নভেম্বর থেকে পুনরায় স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে।

—সঃ স্বঃ

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৪ সেপ্টেম্বর,
২০১৮

প্রকাশিত হবে
২৪ সেপ্টেম্বর,
২০১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মিথমুক্ত গান্ধীজী

মিথ অর্থাৎ কিংবদন্তী। মিথ মানে সত্যের আড়ালে নানারকম মিথ্যেও। গান্ধীজীর জীবন এরকম অনেক মিথে ভরা। গান্ধীজীর একটি ঐশ্বরিক ইমেজ তৈরির চেষ্টায় গত সত্তর বছর ধরে কংগ্রেসি এবং বামপন্থী ঐতিহাসিকরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন। সফলও হয়েছেন। এবার সময় এসেছে এইসব মিথের সত্যাসত্য যাচাই করার। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় মিথের কৃত্রিমতা সরিয়ে প্রকৃত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে তুলে ধরা হবে। লিখবেন অচিন্ত্য বিশ্বাস, রন্তিদেব সেনগুপ্ত প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শহুরে নকশালরা সন্ত্রাসের ইন্ধনদাতা

মাওবাদীদের সঙ্গে সংযোগ এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকিবার অভিযোগে সম্প্রতি ভারভারা রাও, গৌতম নওলাখাসহ কয়েকজন অতি পরিচিত শহুরে নকশালপন্থীকে আটক করিয়াছে মহারাষ্ট্র পুলিশ। যদিও, আপাতত তাহারা কারাভ্যন্তরে নয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গৃহেই অন্তরীণ রহিয়াছেন। এই পরিচিত শহুরে নকশালদের পুলিশ আটক করিবার প্রতিবাদে এদেশের তথাকথিত মানবাধিকার কর্মী, বামপন্থী লেখক-অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীগণ এবং তৎসঙ্গে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস আসর মাত করিতে বাজারে নামিয়াছে। এই প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য—শহুরে নকশালদের এইভাবে আটক করিয়া মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। প্রতিবাদীদের মতে, ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্যাসিস্ট মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিরাও কার্যত এই প্রতিবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন—গণতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি সেফটি ভালবের মতো। সেইটি না থাকিলে প্রেসার কুকার স্বরূপ গণতন্ত্রটি যে কোনও মুহূর্তে ফাটিয়া যাইতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিদের অবমাননা করা, বা অবজ্ঞা করিবার স্পর্ধা আমাদের নাই। তাহা আমরা করিতেও চাহি না। আমাদের একটি সহজ, সরল প্রশ্ন রহিয়াছে। এক্ষণে, সেইটিই আমরা উপস্থাপিত করিতে চাহি। কয়েকজন শহুরে নকশালকে আটক করিবার পরে বারংবার যে মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি বিভিন্ন মহলে আলোচিত হইতেছে— সেই অধিকারটি কি একমাত্র এই শহুরে নকশালদের জন্যই সংরক্ষিত? এই শহুরে নকশালরা যাহাদের পক্ষে কাজ করেন, যাহাদের প্রতি সমর্থন এবং সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন—সেই মাওবাদীরা মানবাধিকারকে কতখানি মর্যাদা দিয়াছে? পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল হইতে শুরু করিয়া মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রত্যন্ত বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে মাওবাদীরা 'ক্যাঙ্গারু কোর্ট' বসাইয়া নিরীহ নিরাপরাধ গ্রামবাসীদের হত্যা করিয়াছে। সরকারি আধিকারিক হইতে শুরু করিয়া পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানদের নির্বিচারে হত্যা করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশে একদিনে মাওবাদী হামলায় ২৫ জন কংগ্রেস নেতা-কর্মী প্রাণ হারাইয়াছেন। এই কাজগুলি কি মানবাধিকারের সংজ্ঞায় পড়ে? আজ যে শহুরে নকশালদ্দরত্রা পুলিশের হাতে আটক হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই মাওবাদীদের এই হত্যার রাজনীতিকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমর্থন জানাইয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, বলা হইতেছে যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ফ্যাসিস্ট মনোভাবাসম্পন্ন। মজার কথা হইল, যে শহুরে নকশালরা এইবার পুলিশের হাতে আটক হইয়াছেন, বিগত ইউপিএ সরকারের আমলেও একই অভিযোগে জেলবন্দি হইয়াছিলেন। তখন বিচারে তাহাদের কারও পাঁচ, কারও বা সাত বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ হইতে শুরু করিয়া, দশ বছরের ইউপিএ সরকারের দুই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পালানিয়প্পন চিদম্বরম এবং শিবরাজ পাতিল—সকলেই এই শহুরে নকশালদের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন। কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা পর্যন্ত গৌতম নওলাখার মতো শহুরে নকশালের কাশ্মীরে প্রবেশের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। আজ যখন আবার এই শহুরে নকশালদের একই অভিযোগে পুলিশ আটক করিতে চাহিতেছে—তখন এই সরকারকে হঠাৎ করিয়া ফ্যাসিস্ট বলিবার যুক্তিটাই বা কোথায়?

হত্যাকারী এবং হত্যার ইন্ধনদাতা—আইনের চক্ষে দুইজনই সমান অপরাধী। আইনের এই সংজ্ঞায়, মাওবাদীদের হত্যার রাজনীতিতে যারা নানাভাবে ইন্ধন জোগাইতেছে—সেই শহুরে নকশালরাও অপরাধী কিছু কম নয়। মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলিবার আগে, এই বিষয়টিও বিবেচনার ভিতর রাখা উচিত।

সুভাষিতম্

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।

নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্বমায়তনং ত্যজেৎ।। (মহাভারত)

বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক পা এগিয়ে অন্য পায়ে ভর দিয়ে আবার পা বাড়ায়। পরবর্তী স্থান না দেখে পূর্ববর্তী স্থান ছাড়া উচিত নয়।

বিহারিদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া দিদির নয়া ড্রামাবাজি

গূঢ় পুরুষের কলম

এবার আমাদের রাজ্যে 'সেতুশ্রী' পুরস্কার দেওয়া হবে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, জয়শ্রী, বিদ্যাশ্রী ইত্যাদির সঙ্গে সেতুশ্রী পুরস্কারের মাধ্যমে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলিকে রক্ষা করা হবে। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য হবে দু'কোটি টাকা। সেতুগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি দপ্তরের করণিক থেকে মন্ত্রী সকলেই টাকার বখরা পাবেন। দ্রুত কাজ শেষ করলে বোনাস অর্থ পাওয়া যাবে। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ২০টি সেতুকে চিহ্নিত করেছেন প্রতিযোগিতার তালিকায়। তবে মুখ্যমন্ত্রী বিরক্ত হয়েছেন, কারণ তাঁর সরকারের কোনও দপ্তরই সেতুশ্রী প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চাইছে না। কলকাতার মাঝেরহাট সেতু, পোস্তার কাছে উড়ালপুল ভেঙ্গে পড়ার পর নবান্নের সব দপ্তরই অস্বীকার করে দায়িত্ব নিতে। মুখ্যসচিবের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সেতু রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতিটা কোন দপ্তরের। পূর্তমন্ত্রী জানিয়েছেন কলকতায় সেতু রক্ষার দায়িত্ব তাঁর দপ্তরের নয়। তাঁরা জেলায় কাজ করেন। কলকাতার উড়ালপুলের দায়িত্ব নগর উন্নয়ন এবং কলকাতা পুরসভার। একটা ব্যাপারে মমতার গোটা মন্ত্রীসভা একমত যে, সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগেরই হওয়া উচিত।

মাঝেরহাট সেতু যে রুগ্ন ছিল তা পূর্ত বিভাগের জানার কথা নয়। কারণ, বিভাগীয় আধিকারিকরা ডাক্তার নন। বুকে স্টেথো ঝুলিয়ে সরকারি হাসপাতালে যাঁরা ঘুরে বেড়ান এবং মাঝে মাঝেই গণধোলাই খান তাঁরাই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। কারণ, রোগ নির্ণয়ের অভিজ্ঞতা ছাড়াও ঠ্যাঙানি খাওয়ার সহ্য শক্তি এই রাজ্যে একমাত্র সরকারি চিকিৎসকদেরই আছে। কথাটা মুখ্যমন্ত্রীর মনে ধরেছে। তিনি সিঙ্গুরের এক রুগ্ন কারখানাকে বাঁচাতে চিকিৎসকদের জন্য বিশেষ ধরনের হেলমেট তৈরির বরাত দিয়েছেন। হেলমেটের নকশা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই করে দিয়েছেন। হেলমেট প্রকল্পের দায়িত্ব দিয়েছেন বেচারামকে। কিন্তু তিনি মন্ত্রীসভার বৈঠকেই গাঁইগুঁই করছিলেন। কারণ, দিদি বলে দিয়েছেন যে, হেলমেটের মান কতটা ভালো বা উপযুক্ত তা দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে হেলমেট পরে পাবলিকের হাতে মার খেতে হবে। সেক্ষেত্রে সারা দেশে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া দেশের অন্য কোনও রাজ্য গণরোষ প্রতিরোধক হেলমেটের কথা ভাবেনি। 'কন্যাশ্রীর' পর হেলমেটশ্রীর জন্য দিদি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন। সরকারি চিকিৎসক সহ সব আধিকারিক পাবলিকের মার খেতে ভয় পাবেন না। এটা কম বড় কথা নয়!

দিদির দৈব শক্তি আছে। যা কেউ পারেন না, দিদি পনেরো মিনিটে সেই সমস্যার সমাধান করে দেন। সপ্তাহ দুয়েক আগে কলকাতার টালিগঞ্জ পাড়ায় বাংলা টিভি সিরিয়ালের শুটিং বন্ধ হয়ে যায়। প্রযোজক এবং কলাকুশলীদের মধ্যে পাওনাগণ্ডা নিয়ে ঝগড়া হয়। টালিগঞ্জে স্টুডিও পাড়ায় গাছের একটা পাতাও নড়ে না মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং তার ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের অনুমতি ছাড়া। দিদি বিশ্বাস-পরিবারের দুই ভাইকে দায়িত্ব দেন সংকট মোচনের।

আসলে দিদি দেখতে চাইছিলেন বিশ্বাস-ভাইদের দৌড় কতটা। দৌড় যে নেই তা অবশ্য দিদির আগেই জানা ছিল। মেগা সিরিয়ালে ডুবে থাকা রাজ্যবাসী হৈচৈ শুরু করে দিলে দিদি নিজে মাঠে নামলেন খেলতে। যে সমস্যাগুলি নিয়ে গত ছয় মাস কথা চালাচালি চলছিল, দিদি মাত্র পনেরো মিনিটে সমাধান করে দিলেন। কট্টর বামপন্থী প্রবীণ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হাতজোড় করে দিদিকে বললেন, ভাগ্যিস আপনি ছিলেন। তাই এত সহজে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। রাজ্যের যে কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় কেন? পাহাড়, জঙ্গলমহল, ভাঙড়, যাদবপুর, কলেজে কলেজে ছাত্রভর্তি, বাসভাড়া, রেশনের বিলি ব্যবস্থা, বেসরকারি হাসপাতালের দৌরাত্ম্য, ডেঙ্গি, টেলি সিরিয়ালে অচল অবস্থা সমাধানের জন্য মন্ত্রীসভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। মাঝেরহাট সেতু ভেঙ্গে পড়ার কারণ খুঁজতে দিদি মুখ্যসচিবকে দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এই দুঁদে আমলা যে ব্যর্থ হবেন সেকথা আগাম বলে দেওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত দিদি তাঁর দৈবশক্তি প্রয়োগ করে বলে দেবেন গলদটা ঠিক কোথায় ছিল। সংবাদমাধ্যম ধন্য ধন্য করবে। যেমন, আমরা করেছি টেলি সিরিয়ালের শুটিং সমস্যার সহজ সমাধানে। একবারও ভেবে দেখিনি যে প্রযোজক সংস্থা, শিল্পী, কলাকুশলী সকলেই মমতা দিদির আজ্ঞাবহ হওয়া সত্ত্বেও অচল অবস্থা সৃষ্টি হয় কীভাবে? সিরিয়াল বন্ধ সমস্যার চটজলদি সমাধান যদি হয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তবে তিনি সহজেই পাবলিকের নয়নের মণি হবেন। কেউ বলবেন না এটা দিদির গটআপ ড্রামা। দিদি নাটক ভালবাসেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, কলকাতায় হিন্দিভাষী বিহারিদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় করে দেবেন। দিদিভাই, ভোটের রাজনীতি নিয়ে নাটক করবেন না। বিহারিরা সপরিবারে নিজ রাজ্যে ভোট দেন। তাঁরা স্নাতকোত্তর পড়তে কলকাতায় আসেন না। তাই বিহারিদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে দেব বললে ভোট পাওয়া যাবে না। ■

সিটি অব ভয়

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

'মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কথা বলছেন।'

মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ঠিক এই ভাষাতেই সরব হয় গোটা রাজ্য। কাজের কাজ না করে কলকাতার জন্য খুব প্রয়োজনীয় জোকা-বিবাদী বাগের কাজই বন্ধ করে দিলেন। অথচ এই মেট্রো প্রকল্প তাঁর হাতে রেলমন্ত্রক থাকার সময়েই ঘোষণা করা হয়েছে। এমনটা সবাই বলছে। কারণ, সত্যকে লুকোতে মেট্রো রেলের উপরে সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্য থেকে মাত্র দু'টি আসনে জেতে বিজেপি। বর্তমানে নরেন্দ্র মোদী সরকারের ভারি শিল্প মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় আগে নগরোন্নয়ন দপ্তরে ছিলেন। সেই সময়ে কলকাতার মেট্রো রেল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছেন বাবুল। মেট্রো প্রকল্পের কাজে গতি আনতে রাজ্যের সঙ্গে একাধিক বৈঠকও করেছেন তিনি। অর্থাৎ দিদির জাতশত্রু কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে গতি আনতে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে।

তবু যত দোষ রেলের। কিন্তু তিনটি প্রশ্নের উত্তর মিলল না মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে। সব দোষ ধরে নেওয়া যাক রেলের। কিন্তু রাজ্য কেন চুপ ছিল? মেট্রো রেলের কাজের জন্য যদি সমস্যা হয়, তবে এতদিন কি ওঁরা ঘুমাচ্ছিলেন? রেলমন্ত্রকের কাছে কোনও অভিযোগ কি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার?

বাস্তবটা কিন্তু অন্য। সব ক্ষেত্রেই দিদির সরকার জমি সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ কাজ শুরু করতে গেলে তখন জমির মালিকরা বাধা দেয়। শুধু মেট্রো প্রকল্পই নয়, এমনকী ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ নিয়ে নীতীন গড়করির বাড়িতে বৈঠক হয়েছে। সেখানে প্রাক্তন মুখ্যসচিব সঞ্জয় মিত্র হাজির ছিলেন। রাজ্যের তরফে সব প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরেও কাজ করতে গিয়ে বাধা পেয়েছে বেসরকারি সংস্থা।

ব্রিজ ভেঙে পড়ার পরে মেট্রো রেলের কাজকেই দায়ী করেন। আসলে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও খুব ভালো করে জানেন কেন এত বছর সময় লাগছে জোকা-বিবাদী বাগ লাইনের কাজ শেষ হতে। যখন উনি রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন এখানকার বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগী হয়নি। আর উনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে তাঁর দলের জমি-নীতিতে এখানে কাজ আটকে থেকেছে। জোকা-বিবাদী বাগ প্রকল্পে মূল সমস্যা ছিল ডায়মণ্ড হারবার রোডের উপরে ট্রাম লাইন সরানো। এতে অনেকটা সময় লেগে যায়। তার পরে সমস্যা হয় টাকশালের জমির উপর দিয়ে মেট্রোর এলিভেটেড লাইন নিয়ে যাওয়া। অর্থ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ছাড়পত্র পেতে সময় লাগে। জোকাতে কারশেড বানানোর জমি নিয়ে সমস্যা তো এখনও পুরোপুরি মেটেনি।

রেল মন্ত্রকের নতুন নীতি অনুযায়ী, যে প্রকল্পে জমি সমস্যা রয়েছে, সেখানে অর্থ বরাদ্দ কম হয়। রেলমন্ত্রক থেকেও বার বার জমি সমস্যা কাটাতে রাজ্যকে অনুরোধ করা হয়। বছর তিনেক আগে থেকে এই প্রকল্পের জমি জট কাটানোর জন্য উদ্যোগী হয় রাজ্য। মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং কলকাতা পুরসভাকে। এর পরে জমি সমস্যা অনেকটা দূর হয়। কাজ শুরু হয় পুরোদমে। ফের থমকে গেল।

শুধু জোকা-বিবাদী বাগ প্রকল্প নয়, কলকাতা এবং শহরতলির সব মেট্রে প্রকল্পেই জমি সমস্যার জেরে অনেক দেরিতে কাজ এগোচ্ছে। নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর, নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর প্রকল্পে জমি সমস্যা কাটার পরেই কাজে গতি এসেছে। কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর রুটেও বাইপাস ও নিউ টাউন এলাকায় অনেক জমি সমস্যা ছিল। একই ভাবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের ক্ষেত্রেও রুট পরিবর্তন এবং জমি সমস্যায় কাজ শুরু হতে অনেক দেরি হয়। রাজ্য সরকারের দাবি ছিল, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ নয়, মেট্রো নিয়ে যেতে হবে ধর্মতলা দিয়ে। এছাড়াও সল্টলেকের কাছে দত্তবাদ এলাকায় জমি জট ছিল। সেটাও কাটিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আসলে দিদি কত দায় নেবেন বলুন তো! ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরে এই নিয়ে তিনবার ব্রিজ ভেঙে পড়ল। উল্টোডাঙা, পোস্তার পরে মাঝেরহাট। এই রকম চললে সরকারটাই তো ভেঙে পড়বে। সেটা কেউ বুঝছে না। সুতরাং, দিদিকে ভুল না বুঝে একটু মেনে নিন। সাবধানে ব্রিজে উঠুন, নামুন।

—সুন্দর মৌলিক

জি এস টি এবং বিমুদ্রীকরণে ভারতের অর্থনীতি বৃদ্ধির নতুন শিখরে

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

নয় নয় করে বিমুদ্রীকরণ নামের 'মহা ধামাকা' ঘটে যাওয়ায় পর ২০ মাস পার হয়ে গেলেও তাকে নিয়ে বিতর্কে ঘাটতির কোনো লক্ষণ কিন্তু নজরে পড়ছে না। বরং, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে বাতিল হওয়া সমস্ত টাকার ৯৯ শতাংশই ব্যাঙ্কে ফিরে আসার যে সাম্প্রতিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে সেই পুরনো বিরোধীরা যেন দ্বিগুণ উৎসাহে সরকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যুক্তি দেওয়া হচ্ছে আর বি আই-এর এই প্রতিবেদনে চূড়ান্ত প্রমাণ যে কালোটাকা আটকানোর যে লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে সরকার দ্রুত অভিযোগের বিরোধিতা করেছে। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বারবার বলেছেন ব্যাঙ্কের ঘরে একবার টাকা ঢুকিয়ে দিতে পারলেই কোনো অবৈধ উপার্জনের টাকা রাতারাতি বৈধ হয়ে যায় না। কিন্তু ব্যাঙ্কে জমা হওয়ার ফলে যেটা অবশ্যই হয়; তা হলো যে টাকা সিন্দুকে বা কার্পেটের তলায় গুঁজে রাখা ছিল তার মালিককে চেনা যায়। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন বিমুদ্রীকরণের পরবর্তী সময়ে যে বিপুল অঙ্কের নগদ টাকা ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে তার সূত্র ধরে আয়কর দপ্তর ১৮ লক্ষ ব্যক্তি ও সংস্থাকে ওই জমাকৃত অর্থের উৎস কী তা ঘোষণা করবার নোটিস দিয়েছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা না দিতে পারলে তাদের ওপর শাস্তিমূলক জরিমানা হবে। অর্থমন্ত্রী জলের মতো সহজ করে বলেছেন— ''কেবলমাত্র ব্যাঙ্কে টাকা জমা পড়েছে বলেই এটা অনুমান করে নেওয়ার কোনও কারণ নেই যে ওই টাকা যথাযথ কর দেওয়ার পরই জমা দেওয়া হয়েছে।''

জেটলির দাবিকে জোরদার করতে আয়কর দপ্তরের দেওয়া তথ্য টনিকের মতো কাজ করবে। ৮ আগস্ট ২০১৮-র মধ্যে অপরীক্ষিত হিসাবের করদাতাদের যে নির্ধারিত রিটার্ন দাখিলের তারিখ ছিল সেই দিন পর্যন্ত ইকনমিক টাইমস ২.৯.১৮ তারিখের তথ্য অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ১ কোটি নতুন রিটার্ন দাখিল হয়েছে। মোট রিটার্ন দাখিল করার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬.৮৪ কোটি। এই সংখ্যা বিগত বছরের ৫.৪৩ কোটির থেকে ২৬ শতাংশ বেশি। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্স-এর তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে তারা জানাচ্ছে বিগত চারটি অর্থবর্ষ ধরেই কর দাতাদের তরফে রিটার্ন দাখিল করার সংখ্যা নাগাড়ে বেড়েই চলেছে। নজর করলেই দেখা যাবে ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে যেখানে ৩.৭৯ কোটি রিটার্ন দাখিল হয়েছিল, ২০১৭-১৮ বর্ষে সেই সংখ্যাই পূর্বোল্লেখিত ৬.৮৪ কোটিতে পৌঁছেছে। অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ৮০.৫ শতাংশ। সংখ্যাকে আরও সূক্ষ্ম চালুনির মধ্যে ছেঁকে পত্রিকাটি জানাচ্ছে; নির্দিষ্ট চাকরি করে রিটার্ন না দেওয়া এমন লোকের সংখ্যা ২০১৭ সালে ছিল ৯৮ লক্ষ যা ২০১৮-তে হয়েছে ২.০৫ কোটি।

হ্যাঁ, এই সংখ্যাতথ্যগুলি বিমুদ্রীকরণ নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষিতে নিশ্চিত ভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই এর মানে কখনই এই নয় যে দেশ থেকে কালো টাকা অপসারিত হয়েছে— মানে যে টাকার মালিক কর প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে চলে এমন টাকা। কিন্তু এ থেকে এটা প্রশ্নাতীত ভাবে প্রমাণ হয় যে, বেশি বেশি সংখ্যায় ভারতীয়রা এখন আইনের নির্দেশিত পথেই হাঁটছে। তারা সৎভাবে কর দেওয়ার ভাবনায় ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।

এখন মানুষের চিন্তা ও ব্যবহারিক স্তরে এই ধরনের পরিবর্তন বিমুদ্রীকরণের ফলেই এসেছিল কিনা তা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিচার করবে। কিন্তু একটা বড় অংশের মানুষ এখনও বিশ্বাস করে যে বেহিসেবি টাকার যে নগ্ন দাপট কিছুকাল আগে অবধি দেখা যেত তা এখন অতীত। করের আওতায় পড়েন এমন ১০০ শতাংশ মানুষকে করজালে অন্তর্ভুক্ত করা ভারতবর্ষের মতো বিশাল ও অর্থনৈতিকভাবে বিচিত্র পেশায় বিভক্ত দেশে একটা নিকট-অসম্ভব ভাবনা বলে মনে হতে পারে। তবু বলতেই হবে বিমুদ্রীকরণের ধাক্কা, আমাদের জীবদ্দশায় কালোটাকার বন্যার জলের মতো বৃদ্ধিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করেছে।

সরকারি আদেশনামা পালন করার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বড় ভূমিকা নিয়েছিল বলে মনে হয়।

(১) দেশে ব্যক্তির ওপর কর (Personal IT) এখন আর টাকা জমানো বা সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব একটা অস্বস্তিকর নয়। ইন্দিরা গান্ধীর সময়ের সমাজবাদী ধারার দমনমূলক কর সংস্কৃতি সবসময়ই কর ফাঁকি দেওয়াকে উৎসাহিত করত তা আজ পুরোপুরি পরিত্যক্ত। অবশ্যই, ভারতে করের হার সিঙ্গাপুর বা আরব এমিরেটস-এর মতো হয়তো অত উদার না হলেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তা তাল মিলিয়ে চলছে।

দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষকে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে অতীতে যে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হতো বিগত সময়ের সব সরকারগুলিই তার সরলীকরণের চেষ্টা করেছিল। নতুন প্রযুক্তির এসে যাওয়া অবশ্যই আশীর্বাদের কাজ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, কী বেতনপ্রাপ্ত কর্মী কী স্বনিযুক্ত পেশাদার উভয়ের ক্ষেত্রেই উৎসমূলে তাদের যে আয়কর কাটা হয়েছে প্যান নং-এর মাধ্যমে তা সরাসরি তাদের Tax form এ চলে যাচ্ছে। এর ফলে কাগজ জমা দেওয়ার কাজ অনেক কমে গেছে। মধ্যবিত্ত করদাতাও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

একই সঙ্গে অসাধু ট্যাক্স আধিকারিকের হাতে থাকা নির্দিষ্ট ফাইলগুলি তুলে আরও পাঁচজনের ফাইলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ায় কর সম্পর্কিত দপ্তরগুলির ঘুঘুর বাসা ভেঙে গিয়েছে।

শুধু তাই নয়, কোনও তথ্যের ক্ষেত্রে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা অনলাইনে করা যাচ্ছে। করদাতাকে বহু সময় ব্যয় করে ব্যক্তিগতভাবে দপ্তরে গিয়ে বসে সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছে না। বাড়তি সুযোগ হিসেবে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রে করদাতার দাখিল করা আয়ের হিসেবই কোনো নিরীক্ষণ (scrutiny) ছাড়াই দপ্তর মেনে নিচ্ছেন।

শেষমেষ cross verification করার যে এলাহি ব্যবস্থা রয়েছে অর্থাৎ প্যান ও আধার সংখ্যা দিয়ে শুরু করে জিএসটি নথিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়াকে খুচরো ব্যবসায়ী ও যে কোনও পরিষেবা প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করে দেওয়ার ফলে নগদ টাকায় সম্পদ সৃষ্টি করা বাস্তবিক কঠিন হয়ে পড়ছে।

তবুও, ভারতে বহু খেলোয়াড় আছেন যারা এত কিছুর জালের মধ্যে থেকেও জাল কেটে বেরোবার চেষ্টা করেন। গয়নাগাটি কেনা, ভূসম্পত্তি ক্রয়, গাড়ি প্রভৃতির কেনা বেচার চেষ্টা চলে।

সরকারের সমালোচকরাও এখন দেশের কর ভিত্তির বিপুল বৃদ্ধি ও মূল অর্থনীতিতে কালো টাকার আগ্রাসন রোখার ক্ষেত্রে এই সরকারের সাফল্যকে অস্বীকার করতে পারছে না। তবু সমালোচকদের অনেকেই বলছে প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করে রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়তো বিমুদ্রীকরণ না করেও করা যেতে পারত। তাদের মতে বিমুদ্রীকরণ অর্থনীতিতে দেশের আধা সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের ওপর আঘাত হেনেছে, কেননা তারা নগদ টাকায় ব্যবসা করতে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত ছিল।

এই অভিযোগ সত্য। কখনই অস্বীকার করা যাবে না যে বিমুদ্রীকরণ ও জিএসটি-র যুগ্ম প্রয়োগে অনেক ছোট-ব্যবসাদার তাদের কারবারে যেসব প্রয়োজনীয় হ্যাপা পোহানোর দরকার তা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু একটা খুব বিচিত্র জিনিস এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের ব্যবসাদারদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রধান অস্ত্রই ছিল ওই কর ফাঁকি দেওয়া। এদের অধিকাংশই কারবার তুলে দিল আর কর জালেও তাই এল না। সংগঠিত ক্ষেত্রের ব্যবসাদাররা যে জিনিস তৈরি করে কর দিয়ে বেচা কেনা করেন সেই একই জিনিসেই তারা কর আওতার বাইরে থেকে বাড়তি সুবিধে পেয়ে যেত ও স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকত। অর্থাৎ কর না দেওয়ায় তাদের লাভটা উঠে আসত। নগদ টাকার দাম মেটানোর ওপর বাধা পড়ে যাওয়া ও জিএসটি-র সঙ্গে শৃঙ্খলিত হয়ে যাওয়ার ফলে তারা বুঝতে পেরেছিল হয় তাদের এই আধুনিক অর্থনীতির অংশীদার হতে হবে, নয়তো ঝাঁপ ফেলতে হবে। হ্যাঁ, অনেকেই যাদের বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ জিএসটি নির্ধারিত ২০ লক্ষ টাকা ছাড়ের ওপরে থাকায় তারা ওই ব্যবসা বন্ধ করার রাস্তাটাই ধরে। পরিণতিতে চাকরি যায় অত্যন্ত নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের।

অবশ্যই অঙ্গীকার করার উপায় নেই যে, বিমুদ্রীকরণ ও তার অনুবর্তী জিএসটি-র প্রবর্তন অর্থনীতির ওপর একটা ওলটপালটের প্রক্রিয়া এনেছিল। কিন্তু প্রারম্ভিক অসুবিধে একবার কাটিয়ে ওঠার পর শেষ ত্রৈমাসিক অর্থবর্ষে অর্থনীতি সাফল্যের শীর্ষসীমা স্পর্শ করেছে। জিডিপি-র হার ছুঁয়েছে ৯.২ শতাংশ। আরও উল্লেখ্য, দেশে চাকরির বাজারে ২০১৭ সালের মার্চ থেকে ২০১৮ মার্চ সময়সীমায় নতুন চাকরি হয়েছে ৭০ লক্ষ। অন্যদিকে চালু হওয়ার পর জিএসটি এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রথম বছরেই দেশে ৪৭ লক্ষ নতুন অর্থনৈতিক উদ্যোগী সংস্থাকে নথিভুক্ত করাতে পেরেছে। এর অভিঘাত হিসেবের সমাজে আরও বাড়তি সুযোগের সৃষ্টি হবে।

বলা দরকার, যখন বিমুদ্রীকরণের ঘোষণা প্রথম হয় তখন অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই তীব্র বিরক্তি জ্ঞাপন করে বলেছিলেন নিশ্চিত সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাঁরা প্রধানত এই ঘোষণার স্বল্প মেয়াদি প্রতিক্রিয়ার ওপরই মনোনিবেশ করেছিলেন, অথচ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল দেশে এক নতুন নৈতিকতাবদ্ধ অর্থনীতির সূচনা করার লক্ষ্যে। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর নিজস্ব সংগৃহীত বিপুল রাজনৈতিক শুভেচ্ছার পুঁজিকে নিয়োগ করে দেশে আধুনিকীকরণের গতিকে বাড়াতে চেয়েছেন। তাঁর আরব্ধ কাজের বিরুদ্ধে যে ভয়ংকর আক্রমণ নেমে এসেছে তার মোকাবিলাতেও তিনি অবিচল থেকেছেন। এখন ধীরে ধীরে সময় এগিয়ে যাওয়ার পর তাঁর এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের সুফল অনুভূত হচ্ছে। তবুও গোটা পরিস্থিতিকে বদলানোর ক্ষেত্রে আরও কিছু সময় দরকার।

দেশের অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার মাননির্ণায়ক যে অধিকর্তারা আছেন তাঁরা বিমুদ্রীকরণের বিরোধী তো ছিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে আবদার করেছিলেন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জিএসটি, সেক্ষেত্রে কী বিপুল রাজনৈতিক জটিলতা জড়িত সে বিষয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। আর আজ তাঁরাই নিজেদের ভুল স্বীকার করতেও উদাসীন।

(লেখক রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং রাজ্যসভার সাংসদ)

> **প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর নিজস্ব সংগৃহীত বিপুল রাজনৈতিক শুভেচ্ছার পুঁজিকে নিয়োগ করে দেশে আধুনিকীকরণের গতিকে বাড়াতে চেয়েছেন। তাঁর আরব্ধ কাজের বিরুদ্ধে যে ভয়ংকর আক্রমণ নেমে এসেছে তার মোকাবিলাতেও তিনি অবিচল থেকেছেন। এখন ধীরে ধীরে সময় এগিয়ে যাওয়ার পর তাঁর এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের সুফল অনুভূত হচ্ছে।**

ওঁরা আসলে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে

ড. জিষ্ণু বসু

হাসপাতালের সামনে দুর্ঘটনা ঘটেছে। আহতদের ঘিরে হাসপাতালে চত্বরে বিভিন্ন লোক। পথ চলতি সদাশয় বাবু, নার্সিংহোমের এজেন্ট, ওষুধের দোকানদার, কম্পাউন্ডার, ডিউটিতে জয়েন করতে আসা ডাক্তারবাবু। এক সদাশয় পথিক বেঁকে যাওয়া হাত মালিশ করে সোজা করছেন। তিনি ভালো মনে করছেন, কিন্তু তিনি জানেন না ভিতরে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে হাড়। ডাক্তার ধমক দিলেন, স্ট্রেচারে করে আহতদের তোলা শুরু হলো। ভিড়ের মধ্যে একজন অতি উৎসাহে এগিয়ে এসেছিলেন। পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে তিনি কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরে গেলেন। শেষ ব্যক্তিটি শববাহী গাড়ির চালক। মানুষ না মারা গেলে তাঁর বিশেষ লাভ নেই।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মহারাষ্ট্র পুলিশ মাওবাদীদের মদতদাতা বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার করেছে। বর্ষীয়ান কবি সদাশয় মানুষ। তিনি কষ্ট পেয়েছেন। উষ্মা প্রকাশ করেছেন। হয়তো বোঝেননি ভিতরে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় গণতন্ত্রের এক একটা অস্থি।

সভাকবি যিনি, তাঁর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিরোধিতা করে এখানে একটি কবিতা লেখা অবশ্য কর্তব্য। কিষণজী, মানে কোটেশ্বর রাও তাঁর মাওবাদী জীবন শুরু করেছিলেন ভারভারা রাওয়ের 'রেভলিউশনারি রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এ যোগ দিয়ে। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের হাতে যেদিন কিষণজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, কিষণজীর ভাইঝিকে নিয়ে ভারভারা রাও নিজে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন মৃতদেহ শনাক্ত করতে। সেদিনও কবি কাঁদতে পারতেন, কিন্তু সভাকবির কি সবসময় কাঁদা সাজে?

রাহুল গান্ধীর পরিবারের সকলেই ভারতীয় গণতন্ত্রের উপরেই মসনদ চালিয়েছেন। ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হলে আখেরে তাঁর বা তাঁর দলের ক্ষতিই হবে, তবু রাজনৈতিক বিরোধিতার এতবড় সুযোগ ছাড়া একেবারেই উচিত নয়। অনেকটা ওষুধের দোকানদারের মতো, রোগী বেঁচে ফিরুক তবে অনেকটা ওষুধপথ্য খেয়ে।

কাগজ জুড়ে উত্তর সম্পাদকীয় লিখছেন বাম বুদ্ধিজীবীরা। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র শেষ হয়ে গেলে কমিউনিস্ট হিসেবে সিপিএম, সিপিআইয়ের দাম থাকবে না কি? তারা চান না মাওবাদীরা জিতুক। ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকুক, না হলে সীতারাম সাহেবের সিট আর আরাম কোনওটাই থাকবে না। কতকটা হরি কম্পাউন্ডারের মতো। তবে এর মধ্যেই মুখ বাড়িয়েছেন ভারভারা রাওদের প্রকৃত সমর্থক। তার মনে প্রাণে দামামা বাজছে। 'ভারত, তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশাল্লা ইনশাল্লা।' এই বিরাট ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো না হলে তাদের কোনও লাভ নেই। তারা সেই শববাহী গাড়ির চালক। ভারতবর্ষের মৃত্যুই তার মুখে হাসি ফোটাতে পারে।

শিক্ষিত সরল চেহারার বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা না পেলে খাগড়াগড়ের মতো ভয়ানক বিস্ফোরণের ঘটনা হতো না। কারণ বর্ধমানের বিস্ফোরণে যে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আই ই ডি) ব্যবহার হয়েছে সেখানেও একই প্রযুক্তি।

যে পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেই ভারভারা রাও, সুধা ভরদ্বাজ, অরুণ ফেরেরা, গৌতম নওলাখা বা ভার্নন গঞ্জালভেসের মানবাধিকারের জন্য লড়াইটা নতুন নয়। এই অতিবামপন্থীদের চোখে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা স্বপ্ন আছে। সেটা খণ্ড-বিখণ্ড, টুকরো টুকরো দুর্বল ভারতবর্ষের। পূর্ব ইউরোপের একটা মডেল তাদের সামনে আছে। রোমানিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়ার মতো দেশগুলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েত রাশিয়া এদের দখল করে তাদের বশংবদ কমিউনিস্টদের বসিয়ে দেয়। তাই ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই এমনই লেখাপড়া জানা বুদ্ধিজীবীদের মাথায় সোভিয়েতের দখলে থাকা টুকরো টুকরো রাজ্যের কল্পনা আসে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই ভারতের কমিউনিস্ট নেতারা রাশিয়ায় গিয়ে জোসেফ স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করে আসেন। ফিরে এসে মাকিনেনি বাসবপুন্নাইয়া বিখ্যাত থিসিস প্রকাশ করেন। প্রকারান্তরে যা রাশিয়াকে ভারত দখলের আহ্বান। কিন্তু ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের পরে তাদের স্বপ্নটা পাল্টে গেল। উঠে এল পরিমল দাশগুপ্ত থিসিস।

সোভিয়েত রাশিয়া নয়, মাও সে তুংয়ের চীন। চীন ভারত দখল করে টুকরো টুকরো ভারত এই সব মাওবাদীদের হাতে দিয়ে যাবে। তারই জন্য এলাকাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন। সেই অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই ঘুরছেন ভারভারা রাও।

কলকাতার শ্রদ্ধেয় এক কবি বলেছেন, কেন্দ্রে ফ্যাসিস্ত সরকার, তাই গ্রেপ্তার হয়েছেন কবি ভারভারারা। তাই কি? আসলে কেন্দ্রে কংগ্রেস আছে না বিজেপি সেটা আদৌ বিষয় নয় ভারভারা রাওদের কাছে।

বিষয় হলো ভারতীয় গণতন্ত্র আছে, একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে। ২০০৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ভারভারা রাও নিজেই বলেছেন যে, সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আর বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহ, তাদের কাছে সমান শত্রু।

তেমনি ২০১০ সালের ১৪ অক্টোবর বুদ্ধদেববাবু এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, মাওবাদীরা আসলে সন্ত্রাসবাদী। তাঁর সরকার রাজ্যে মাওবাদীদের সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই করছে। ইউপিএ-২ সরকারের দুই প্রধান রাজনেতা মনমোহন সিংহ এবং পি চিদম্বরম একাধিক বার বলেছেন, সেদিনের ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা ছিল মাওবাদ। সেদিনও বার বার উঠে এসেছে ভারভারা রাওয়ের নাম। আজ যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে এঁদের বিরুদ্ধে, তখন মনে রাখা প্রয়োজন, সেটা কোনও ব্যক্তিকে হত্যার বিষয় নয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের সাংবিধানিক অন্যতম প্রধানকে হত্যা, আর ওই আসনে মনমোহন সিংহ আছেন না নরেন্দ্র মোদী, সেটা ভারভারা রাওদের কাছে সামান্যই মহত্ত্ব রাখে।

একটা মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে হলে তার শরীরের রোগের খবর রাখতে হবে। আর সেই অসুখ যাতে আরও বাড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ভারভারা রাও বা গৌতম নওলাখারা সেই কাজই করছেন। ভারতবর্ষের সমাজের সবচেয়ে বড় ব্যাধি জাতিভেদ। ওই ব্যাধির উপশম না করে যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষ অবশ্যই টুকরো টুকরো হবে।

বিগত এক দশক ধরে ভারতবর্ষের যতগুলো জাতিদাঙ্গা হয়েছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে অতি বাম পরিকল্পনা। ‘ভীমা কোরেগাঁও’ এমনই বিতর্কিত বিষয়। মহারাষ্ট্রে পেশোয়া সাম্রাজ্যের শেষ দিকে জাতিভেদ এক ভয়ানক ব্যাধির রূপ নিয়েছিল। অন্ত্যজ মাহারদের পেশোয়া তার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে দেয়নি। মাহাররা বিদেশি ইংরেজের পক্ষ নিয়ে দেশীয় রাজা পেশোয়াদের হারিয়ে দেয়। এই দু’শো বছরের পুরাতন জাতিভেদের আগুনকে উস্কে দিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল এই বুদ্ধিজীবীদের। কিন্তু আরও ১৫০ বছর আগে যে মারাঠা রাজা শিবাজী তফশিলি উপজাতি মাওয়ালি সেনা নিয়ে একের পর এক মুঘল দুর্গ জয় করেছিলেন, সেটাকে স্মরণ করা যায় না?

না, সেটা তো সামাজিক সমরসতার উদাহরণ। জাতিভেদের আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার কাজটাই এঁরা করবেন। কারণ তাঁদের মূল উদ্দেশ্য দেশটাকে টুকরো টুকরো করা। এদের প্ররোচনাতেই বহু বছর বাদে পুণেতে আবার ‘ভীমা কোরেগাঁও’ বিবাদ নিয়ে জাতিদাঙ্গা হয়েছে এ বছর জানুয়ারি মাসে।

দিল্লি বা কলকাতার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস গেলে অধ্যাপকরা দেড় লক্ষ টাকা বেতন পান। বস্তারের আদিবাসীরা কেন ল্যান্ডমাইন ব্যবহার করবে, তার সমর্থনে তিনি বক্তব্য রাখেন, খবরের কাগজের পাতা জুড়ে উত্তর-সম্পাদকীয় লেখেন। প্রথম বর্ষের ছাত্রদের অতিবাম ভাবনায় দীক্ষা দেন। একটু ঘনিষ্ঠ হলেই দেখা যায় যে, ওই অধ্যাপক ভদ্রলোক ব্যক্তিজীবনে এক নিপাট পেটি বুর্জোয়া। ওই অতিবাম পন্থা হলো তাঁর ‘স্টাইল স্টেটমেন্ট’। একটা ‘টু-স্টেজ ল্যান্ডমাইন’ বস্তারের জঙ্গলে লাগাতে খরচ হয় কমবেশি ৪০ হাজার টাকা। ওই টাকায় গোটা একখানা বনগ্রামের গরিব বনবাসীদের কয়েকদিন পেট ভরে খাওয়ানো যায়। কিন্তু চীন বা পাকিস্তান ওই গরিব বনবাসীদের খাবার জন্য টাকা দেবে না, ল্যান্ডমাইন দেবে। এই সত্যি কথাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের একটি নিরক্ষর রিকশাচালক বোঝেন, শিক্ষিত ওই ভদ্রলোকরা বোঝেন না। আজকের দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। দান্তেওয়ারায় দেশের জওয়ানদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হলে এই বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে শিক্ষক- ছাত্রেরা একসঙ্গে মদ-মাংসের উৎসব করেন। তার পর রাতে বিজয় মিছিল হয়।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করাই এই অতিবামপন্থীদের মূল লক্ষ্য। এই কাজে যে-কোনও মত বা পথের লোকই তাদের বন্ধু। আপাত ভাবে নাস্তিক অতিবামপন্থীরা ভারতবর্ষে তাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে জেহাদি মৌলবাদী শক্তিকে বেছে নিয়েছে। আজকের কাশ্মীরে হিজবুল মুজাহিদিন বা জইশ-ই-মহম্মদের মতো সংগঠনগুলির উগ্র ইসলামি মৌলবাদ ছাড়া আর কোনও আদর্শই নেই। কাশ্মীরের নিরীহ পণ্ডিতদের খুন করে, অত্যাচার করে, ধর্ষণ করে ওই উগ্রপন্থীরা উপত্যকা ছাড়া করেছে। তাদের অত্যাচারে আজও কাশ্মীরের হিন্দুরা নিজের দেশেই উদ্বাস্তু। আর ওই নিষ্ঠুর উগ্রপন্থীদের নিয়েই দিল্লিতে সংবর্ধনা সভার ব্যবস্থা করেন এই বুদ্ধিজীবীরা। সেখানে স্লোগান ওঠে, ‘ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশাল্লা, ইনশাল্লা!”

২০১০ সালে কলকাতার সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর এক সাংঘাতিক তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রথম রেডিও কন্ট্রোল্ড

যাঁরা তালিবানদের কাছ থেকে বিস্ফোরণের প্রযুক্তি আনেন, যাঁরা দান্তেওয়ারায় দেশের বীর জওয়ানদের অনৈতিক ভাবে হত্যা করলেন, যাঁরা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে খতম করার জন্য দিনরাত কাজ করছেন, তাদের ‘মানবাধিকার’ যেন কোনও ভাবেই নষ্ট না হয়।

এক্সপ্লোসিভ বা রিমোট কন্ট্রোল্ড এক্সপ্লোসিভ প্রযুক্তি এনেছিল মাওবাদীরা। তারা আফগানিস্তানের তালিবানদের কাছ থেকে কাশ্মীরের মুজাহিদিনদের মাধ্যমে এই হাই ফ্রিকোয়েন্সি অপারেটেড সিস্টেম বা আল্ট্রা-হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডিটোনেটর প্রযুক্তি ভারতে এনেছে। তাই সহজ ভাবে বললে বলা যায় যে, এই শিক্ষিত সরল চেহারার বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা না পেলে খাগড়াগড়ের মতো ভয়ানক বিস্ফোরণের ঘটনা হতো না। কারণ বর্ধমানের বিস্ফোরণে যে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আই ই ডি) ব্যবহার হয়েছে সেখানেও একই প্রযুক্তি।

আরেকটা মজার বিষয় হলো এই 'মানবাধিকার' কথাটা। যাঁরা তালিবানদের কাছ থেকে বিস্ফোরণের প্রযুক্তি আনলেন, যাঁরা দান্তেওয়ারায় দেশের বীর জওয়ানদের অনৈতিক ভাবে হত্যা করলেন, যাঁরা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে খতম করার জন্য দিনরাত কাজ করছেন, তাদের 'মানবাধিকার' যেন কোনও ভাবেই নষ্ট না হয়। এই মানবাধিকার রক্ষার জন্য সব চেয়ে নামকরা আইনজীবীকে দাঁড় করানো হয়, কোটি কোটি টাকা আকাশ থেকে চলে আসে। তাদের জন্য রোমিলা থাপারের মতো অধ্যাপিকা পিটিশনার হন, অরুন্ধতী রায়ের মতো লেখিকা বিশ্বজুড়ে অর্থ সংগ্রহ করেন। কিন্তু মাওবাদীরা তো মাও সে তুংয়ের দেখানো পথে ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেন। সেই মাও সাহেবের চীনে মানবাধিকার কতটুকু আছে? তিয়ান-আন-মেন স্কোয়ারে এতগুলো মানুষের কোনও মানবাধিকার ছিল না? চীন কূটনৈতিক ভাবে সবচেয়ে অসহযোগী দেশ। ভারতের সঙ্গে তো বটেই, সোভিয়েত রাশিয়া, ভিয়েতনামের মতো সাম্যবাদী দেশের সঙ্গেও চীনের প্রবল বৈরিতা ছিল।

চীনের সাম্যবাদের উজ্জ্বল নমুনা হায়নান প্রদেশের স্পেশাল ইকনমিক জোন। সেখানে সারা পৃথিবীর সব পুঁজিপতিরা ভিড় করেছেন। সেখানে দিনে গড়ে ১২/১৩ ঘণ্টা কাজ করতে হয় ওই এস ই জেডের শ্রমিকদের। কোনও মহিলা সন্তানসম্ভবা হলে তার জন্য কোম্পানির কোনও সুবিধা দেওয়ার দায় নেই। আদতে পৃথিবীর কোনও পুঁজিপতি দেশের শ্রম আইনের থেকেও অনেক খারাপ হায়নানের নিয়ম। মে দিবসের অঙ্গীকার অনুযায়ী শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টার কাজ, ৮ ঘণ্টা বিনোদন আর ৮ ঘণ্টা বিশ্রামের অর্জিত অধিকার পায়ে পিষে দিয়েছে চীনের এস ই জেডের নিয়ম। সিঙ্গুরের সময় কৃষি জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন ভারভারা রাও। কিন্তু হায়নানের এস ই জেডের নীচে চাপা পড়ে গেছে কয়েক হাজার সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম। সেই কৃষকদের মানবাধিকারের কী হলো? আচ্ছা, একটা সহজ প্রশ্নের উত্তর দিন ভারভারা রাও। বেজিংয়ের রাস্তায় দুটি কলেজ ছাত্রীকে পুলিশ গান্ধীবাদী পোস্টার লাগাতে দেখল। তারপর তাদের কী হবে? সরল উত্তর, মেয়ে দুটিকে আর কেউ কখনো খুঁজে পাবে না। যাঁরা নিজেরা ক্ষমতায় এলে বিরোধীদের মানবাধিকারের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করবেন না, তাঁরাই মানবাধিকারের জন্য সবচেয়ে বেশি চিৎকার করছেন?

তবে নরেন্দ্র দামোদর মোদীর একটা অপরাধ অবশ্যই আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইউপিএ-১ এবং ইউপিএ-২ সরকার ছিল মাওবাদের স্বর্ণযুগ। সাউথ এশিয়া টেররিজম পোর্টালের ২০১০ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, যে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, কেরল মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু বা পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনও সপ্তাহ যায়নি যেখানে কোনও না কোনও মাওবাদী উপদ্রব হয়েছে (http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/terroristoutfits/cpi_m_timeline10.htm)। সেখান থেকে মাওবাদীরা গত পাঁচ বছরে আজ কাগজের বাঘে পরিণত হয়েছে। এই রাহুমুক্তির মূল কাণ্ডারি অবশ্যই নরেন্দ্র মোদী। তাই মোদীকে নিকেশ করা মাওবাদীদের তথাকথিত বিপ্লবের জন্য অবশ্যই একটা বড় সাফল্য হবে। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার চক্রান্ত সত্যিই হয়েছে। তাই পুলিশের সন্দেহের তির মাওবাদের জাতীয় স্তরে মদতদাতাদের দিকে যাওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক?

গণতন্ত্রের বিকল্প গণতন্ত্রই; মাওবাদের মতো কোনও একদলীয় ব্যবস্থা কখনওই না। তাই এই বুদ্ধিজীবীরা মাওবাদের সমর্থনে যে কটি ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন চালাচ্ছেন, সেগুলির মুখোশ খুলে আসল চেহারা জনসমক্ষে আনতে হবে।

আজ ভারতবর্ষের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মকে ভাবতে হবে যে, এই তথাকথিত কতিপয় শিক্ষিত মানুষের চীনের প্রতি, মাওয়ের প্রতি রোমান্টিক স্বপ্নের খেসারত দেশের মানুষ আর কতদিন দেবে? ভারতের অনেক সমস্যা— দারিদ্র আছে, বঞ্চনা আছে, দুর্নীতি আছে, জাতিভেদ আছে। কিন্তু তার সমাধান কখনোই দেশটাকে টুকরো টুকরো, খণ্ডবিখণ্ড করে হবে না। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে হত্যার চক্রান্তকে আজ কঠোর হাতে দমন না করলে ভারতের ভবিষ্যৎ পল পটের কাম্বোডিয়ার মতো হবে। সুতরাং মাওবাদীদের জাতিদাঙ্গার ফাঁদে পা দিলেই মূর্খামি হবে। গণতন্ত্রের বিকল্প গণতন্ত্রই; মাওবাদের মতো কোনও একদলীয় ব্যবস্থা কখনওই না। তাই এই বুদ্ধিজীবীরা মাওবাদের সমর্থনে যে কটি ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশন চালাচ্ছেন, সেগুলির মুখোশ খুলে আসল চেহারা জনসমক্ষে আনতে হবে। ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ ভুলে সকলে মিলে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ দেশে গণতন্ত্র বাঁচলে তবেই কেবলমাত্র মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকবে। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

চাটুকার সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করছে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

অর্ধসত্য মিথ্যার থেকেও ভয়ংকর। বর্তমানে এই অর্ধসত্যেরই বেসাতি করতে নেমেছে কিছু বাজারি সংবাদমাধ্যম। উদ্দেশ্য একটিই। নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারটি সম্বন্ধে জনমানসে বিভ্রান্তি ও বিরাগ সৃষ্টি করা। সেই জন্যই প্রকৃত ঘটনাটিকে আড়ালে সরিয়ে রেখে অসত্য এবং অর্ধসত্যের প্রচার। বারবার মিথ্যা প্রচার করলে সেই মিথ্যাকেই একসময় সত্য বলে মনে করে মানুষ— প্রচার বিশেষজ্ঞরা এমনই মনে করেন। নরেন্দ্র মোদী সরকারে আসার পর থেকে গত প্রায় পাঁচ বছরে প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে এই মিথ্যাকেই ক্রমাগত প্রচার করে গেছে অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম। এবং একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, তাদের প্রতিনিয়ত অসত্য এবং অর্ধসত্য প্রচারের ফলে দেশের কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেনও। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই এই বাজারি সংবাদমাধ্যম প্রচার করতে উঠে পড়ে লেগেছে যে, নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। সাম্প্রতিক সবকটি নির্বাচনে বিজেপির বিপর্যয় ঘটছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাই বিজেপির পরাজয় এবং মোদীর বিদায় সুনিশ্চিত। বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প হিসাবে এই বাজারি সংবাদমাধ্যম এখন তুলে ধরছে কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধীকে। এইসব সংবাদমাধ্যমে ইতিমধ্যেই রাহুলকে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চিত্রিত করা শুরু হয়ে গেছে। রাহুলের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান এরকম প্রচার করে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হচ্ছে— ২০১৯-এ রাহুলের নেতৃত্বে বিজেপি বিরোধী জোটের সরকার গড়ার সম্ভাবনাই প্রবল। এবং এই অসত্য ও অর্ধসত্যকে এমন একটি মোড়কে পরিবেশন করা হচ্ছে, যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে তাকেই সত্য বলে মনে করে।

এই বাজারি সংবাদমাধ্যম কীভাবে এই অসত্য এবং অর্ধসত্য প্রচার করছে? সাম্প্রতিক দুটি উদাহরণ তুলে দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সম্প্রতি কর্ণাটকে পুরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই পুর নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছে ৯৮২টি আসন। বিজেপি পেয়েছে ৯২৯টি আসন। এই ফলাফলকে তুলে ধরে বাজারি সংবাদপত্রগুলি লিখেছে, কর্ণাটকে কংগ্রেসের অগ্রগতির সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি। এবং বিজেপির এই বিপর্যয় ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। এক ঝলক খবরটি পড়লে মনে হবে, সংবাদমাধ্যমগুলি ভুল তো কিছু লেখেনি। আসনের নিরিখে কংগ্রেস সত্যিই তো বিজেপির থেকে এগিয়ে রয়েছে। ওপর ওপর ভাবলে মনে হতেই পারে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কর্ণাটকে অন্তত বিজেপির ফলাফল ভালো হবে না। কিন্তু এ সবটাই ওপর ওপর। আসলে কর্ণাটক পুর নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে যে সংবাদ প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যমগুলি, তা সম্পূর্ণ অর্ধসত্য। প্রকৃত তথ্য কিন্তু ওই সংবাদে তুলে ধরা হয়নি। তা আড়াল করা হয়েছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই। প্রকৃত তথ্যটি তাহলে কী? প্রকৃত তথ্য হলো— কর্ণাটকে এর আগে পুর নির্বাচনে বিজেপির জেতা আসন ছিল ৪৯৬টি। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৯২৯টি। আর কংগ্রেসের এর আগে জেতা আসন ছিল ৯১৪টি। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৯৮২টি। বিজেপির আসন সংখ্যা বেড়েছে ৪৬ শতাংশ। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ১০ শতাংশও বাড়েনি। এই পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট কর্ণাটকে বিজেপির পায়ের নীচে মাটি অনেকটাই শক্ত হয়েছে। এই পরিসংখ্যানই কিন্তু বলে দেয় প্রকৃত অগ্রগতিটা কার হলো। এতেই বেশ বোঝা যায় ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কর্ণাটকে বিজেপি অনেকটাই লাভবান হবে। বাজারি সংবাদমাধ্যম অর্ধসত্য প্রচার করেছে এই কারণেই যে, কর্ণাটকে বিজেপির এই অগ্রগতিটাকে তারা দেখাতে চায়নি। বরং রং চড়িয়ে কংগ্রেসের সম্বন্ধে ফোলানো-ফাঁপানো প্রচারই করতে চেয়েছে তারা।

> **যারা কালোকে সাদা বলে প্রচার করতে চাইছেন, মিথ্যা এবং অর্ধসত্য প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন— তারা শুধু বস্তুনিষ্ঠ ও সৎ সাংবাদিকতারই বিরুদ্ধাচারণ করছেন না, পাশাপাশি, নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাও হাড়িকাঠে চড়াচ্ছেন।**

এবার আসুন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বাজারি সংবাদমাধ্যমগুলি যে অসত্য প্রচার করে চলেছে সে প্রসঙ্গে। রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশই বাড়ছে বলে বাজারি সংবাদমাধ্যমগুলি যতই

প্রচার করুক না কেন— বিভিন্ন সংস্থার করা সমীক্ষায় কিন্তু তার উল্টো চিত্রই ধরা পড়েছে। সম্প্রতি দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক রণনীতিবিদ এবং বিশ্লেষক প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিকাল অ্যাকশন কমিটির ন্যাশনাল অ্যাজেন্ডা ফোরাম একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। ৫৭ লক্ষের বেশি মানুষের ভিতর এই সমীক্ষা চালানো হয়। এই সমীক্ষায় ৪৮ শতাংশ মানুষ নরেন্দ্র মোদীকেই আবার প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে চান। মাত্র ১১.২ শতাংশ মানুষ রাহুল গান্ধীকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। ৯.৩ শতাংশ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে, ৭ শতাংশ অখিলেশ যাদবকে এবং মাত্র ৪.২ শতাংশ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। টাইমস অফ ইন্ডিয়া গোষ্ঠীও কয়েক মাস আগে অনুরূপ একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। ওই সমীক্ষাতেও ৭১ শতাংশ মানুষ নরেন্দ্র মোদীকেই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চেয়েছেন। ২০ শতাংশের মতো মানুষ রাহুল গান্ধীর পক্ষে মত দিয়েছিলেন। মজার কথা হলো, যেসব বাজারি সংবাদমাধ্যম রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন, তারা কিন্তু এই সমীক্ষাগুলি কখনই গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেনি। দায়সারা ভাবে প্রকাশ করে পাঠকের চোখের আড়াল করতে চেয়েছে।

কিন্তু এক্ষেত্রেও ভাববার বিষয় আছে। সংবাদমাধ্যমের এই অসত্য এবং অর্ধসত্য প্রচারে মানুষ কি সত্যিই বিভ্রান্ত হচ্ছে? হলে, কতখানি হচ্ছে? এই অসত্য এবং অর্ধসত্য প্রচারে কিছু সংখ্যক মানুষ বিভ্রান্ত হলেও গরিষ্ঠাংশ মানুষ যে বিভ্রান্ত হচ্ছে না— তা একদম হলপ করে বলে দেওয়াই যায়। যদি গরিষ্ঠাংশ মানুষ বিভ্রান্ত হতো— তাহলে দুটি নামি সংস্থার সমীক্ষায় জনপ্রিয়তায় রাহুলকে পিছনে ফেলে মোদী এগিয়ে থাকতেন না। এটাই প্রমাণ করে, মানুষ নিজস্ব বিচার বুদ্ধি এবং বিবেচনা দিয়ে তার পারিপার্শ্বিক বুঝে নেয়। সংবাদমাধ্যমের সর্বজ্ঞ কলমচিরা তাদের হাজার চেষ্টা করেও ভুল বোঝাতে পারেন না। সেটা এই বাজারি সংবাদমাধ্যমও বোঝে। কাজেই সময় বিশেষে বাঁ হাতে মনসা পুজো দেওয়ার মতো করে তারা বাস্তবটিকে স্বীকার করে। মাসখানেক আগে আনন্দবাজার পত্রিকা, যারা চরিত্রগতভাবে কংগ্রেসের সমর্থক এবং চূড়ান্ত মোদী বিরোধী, তারা গুজরাটের ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। সমীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাটের মানুষের কী মনোভাব। সমীক্ষাটিতে ফলাও করে তুলে ধরা হয়েছিল— সেখানকার বিজেপি সরকারের কাজকর্ম মানুষকে হতাশ করেছে। কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে, বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে ইত্যাদি। অর্থাৎ বিজেপির বিরুদ্ধে যতরকম নঞর্থক প্রচার তুলে ধরা যায়, তাই ধরা হলো। কিন্তু সমীক্ষার একেবারে শেষে এসে ওই সংবাদপত্রও একটি লাইন না লিখে পারল না যে, এতদ্ সত্ত্বেও গরিষ্ঠাংশ মানুষ আবার নরেন্দ্র মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাইছেন। কারণ, তারা মনে করছেন নরেন্দ্র মোদীর কোনও বিকল্প এই মুহূর্তে নেই। অর্থাৎ যতই বিরুদ্ধে প্রচার করা যাক না কেন, সত্যটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার কিন্তু এই বাজারি সংবাদমাধ্যমও করতে পারছে না।

মিথ্যা এবং অসত্য প্রচারে এই রাজ্যের সংবাদমাধ্যমগুলিও পিছিয়ে নেই। দু-একটি উদাহরণ দিই। মোদিনীপুরে নরেন্দ্র মোদীর বিশাল জনসভার পরপরই ওই একই স্থানে তৃণমূল কংগ্রেস পাল্টা সভা ডেকেছিল। সভার মুখ্য বক্তা ছিলেন সংসদ সদস্য এবং তৃণমূল দলটির অলিখিত দু' নম্বর নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত তৃণমূল কংগ্রেসের বড় সমর্থক একটি সংবাদপত্র ওই সমাবেশ মঞ্চের ছবি প্রকাশ করল। সমাবেশে ভিড়ের ছবি দেখালো না। সংবাদে লিখল, অভিষেকের সভায় ব্যাপক জনসমাগম হয়েছে। বাস্তবটি কিন্তু তার বিপরীত। ওই সমাবেশের পর পরই সমাবেশ স্থলে জনসমাগমের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা যায়, সমাবেশ স্থল অর্ধেকও ভরেনি। প্রমাণ হয়ে যায়, ওই সংবাদপত্র একটি ফ্লপ সমাবেশকে তাদের পাঠকের কাছে মিথ্যার মোড়কে পরিবেশন করেছিল।

বস্তুত সংবাদপত্রের এই চরিত্র সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতাও নষ্ট করেছে। খুশবন্ত সিংহের মতো সাংবাদিকও জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা এবং সঞ্জয় গান্ধীর গুণকীর্তন করতে গিয়ে নিজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। আজকেও যারা কালোকে সাদা বলে প্রচার করতে চাইছেন, মিথ্যা এবং অর্ধসত্য প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন--- তারা শুধু বস্তুনিষ্ঠ ও সৎ সাংবাদিকতারই বিরুদ্ধাচারণ করছেন না, পাশাপাশি, নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাও হাড়িকাঠে চড়াচ্ছেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করে লেখাটি শেষ করব। তখন সিপিএমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। দলের রাজ্য সম্পাদক তখন অনিল বিশ্বাস। ওই সময় আমার অতি পরিচিত সিপিএম ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিক, যিনি আবার ব্যক্তিগত জীবনে সিপিএমের পার্টি সদস্যও ছিলেন, অনিল বিশ্বাসের কাছ থেকে একটি কাজের গুরুদায়িত্ব পান। কাজটি আর কিছুই নয়। সেই সময় সিপিএমের এক নবীন মন্ত্রীর জীবনযাপন এবং চালচলন সম্বন্ধে অনিলবাবুর কাছে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছিল। অনিলবাবু ওই সাংবাদিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, একটু খোঁজখবর করে দেখতে অভিযোগগুলি সত্য কিনা। কিন্তু শুধু ওকে দায়িত্ব দিয়ে অনিলবাবু নিশ্চিন্ত থাকেননি। গোপনে পার্টির আর এক সর্বক্ষণের কর্মীকেও দায়িত্ব দিয়েছিলেন খোঁজখবর করতে। কিছুদিন পরে ওই সাংবাদিককে অনিলবাবু জিজ্ঞাসা করেন--- কী গো, খোঁজখবর কিছু নিলে? সাংবাদিকটি সঙ্গে সঙ্গে বলেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওসব ঠিক না। একদম ফালতু অভিযোগ। শুনে অনিলবাবু হাসতে হাসতে ওই সাংবাদিককে বলেছিলেন— ও (মন্ত্রীর নামোল্লেখ করে) চেপে যাওয়ার জন্য তোমাকে কত দিল? রোজ যেমন মিথ্যা খবর লেখ, আমাকেও তেমনি মিথ্যে খবর দিতে এলে?

এই কাহিনিটির নীতিকথা একটিই— চাটুকারকে তার প্রভুও বিশ্বাস করেন না।

বাজারি কলমবাজদের মতে পরকীয়া অপরাধ নয়

নরেন্দ্রনাথ মাহাতো

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারায় বর্ণিত ব্যভিচার সংক্রান্ত আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। বিদেশের বিভিন্ন আদালত ব্যভিচারকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করার দাবি খারিজ করেছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যভিচার একটি অপরাধ। কারণ নারী-পুরুষের এই অবৈধ সম্পর্ক বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ, মূল্যবোধ ও পারিবারিক জীবনের ভিত্তিকে ধ্বংস করে। কিন্তু পাশ্চাত্যের ব্যভিচারতন্ত্রের শিকার হওয়া বাজারি কলমবাজদের মতে পরকীয়া অপরাধ নয় এবং তাঁদের এই ধারণাকে কুযুক্তির যাহায্যে ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন শিল্পে, সাহিত্যে, কাব্যে ও নাট্যে। সম্প্রতি ১৫৮ বছরের পুরানো ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত পরকীয়া বা ব্যভিচার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছে এবং তা নাকি বাজারি কলমবাজদের মতকেই সমর্থন করেছে। এমনই দাবি তাদের।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ নাকি জানিয়েছে, দেশের আইনে পরকীয়া বিষয়ক ধারাটি যে কেবল লিঙ্গবৈষম্যের দোষে দুষ্ট তাই নয়, এর মধ্যে নারী সম্পর্কেও হীন মনোভাব রয়েছে। কোনও পুরুষের মত না থাকলে তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া আইনত দণ্ডনীয়— একথা মানতে গেলে স্ত্রী স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়। স্ত্রীর আলাদা অস্তিত্ব বলে কিছু থাকে না। বাজারি কলমবাজদের আরও বক্তব্য, ভারতের মতো দেশে ঐতিহ্যগত ভাবেই নারীর স্থানটি পুরুষতন্ত্রের বিশালাকার ভাবের নীচে পিষ্ট-ক্লিষ্ট। তার উপর বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির বৈধতা ও তার চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আইন যদি নারীদেহকে স্বামীর সম্পত্তি ভিন্ন আর কিছুই না মনে করে, তবে দেশের সংবিধানে যে লিঙ্গ সাম্যের কথা আছে, আইন তার

> **"স্বাধীনতা, সাম্য ও আধুনিকতার নামে পরকীয়া বা ব্যভিচার তথা পশুত্বের জয়ধ্বনি দিয়ে তাকে আইনসিদ্ধ করার দুর্বুদ্ধি জাগে, তবে তা হবে ভারতের পক্ষে আত্মহত্যার শামিল, সন্দেহ নেই।"**

সম্পূর্ণ পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোনও পুরুষের সম্পর্ক হবে কী হবে না, তা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে স্বামীর স্বীকৃতির কথা উঠেছে কেন? আবার, স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর সঙ্গে অন্য নারীর সম্পর্ক হলে কে অপরাধী গণ্য হবে?

নারী হিতৈষী বাজারি কলমবাজদের আরও বক্তব্য, কোনও বিবাহে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই গুরুত্ব দেওয়া আধুনিক ভদ্র সমাজের দস্তুর। সেই দস্তুর অনুযায়ী, নিজের দেহের উপর পুরুষের মতো নারীরও নিজের সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। প্রশ্ন হলো, কেবল পুরুষই পরকীয়া করবে আর নারী করবে না, এমন কোনও দস্তুর আছে নাকি ভারতীয় সমাজে? যদি না থাকে তবে নিজের দেহের উপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, তেমনি নারীরও অধিকার আছে একথা বলার অর্থ কী? আবার, নারী ছাড়া পুরুষের পরকীয়া কিংবা পুরুষ ছাড়া নারীর পরকীয়া হয় কী করে? পরকীয়াকে কি পুরুষতান্ত্রিক ও নারীতান্ত্রিক এভাবে ভাগ করা যায়? তাছাড়া, স্বামী ও স্ত্রীর ইচ্ছা- অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়ার মানে কি পরকীয়ায় সম্মতি দেওয়া? এটাই কি আধুনিক ভদ্র সমাজের দস্তুর? তাহলে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? বিবাহ মানে কি মুক্ত যৌনতা তথা বহুপরায়ণতা? না এক পরায়ণতা?

বিচারপতি চন্দ্রচূড় নাকি প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতীয় পরিবারগুলিতে যখন সাধারণ ভাবেই নারী নিগৃহীত নির্যাতিত— সেখানে পরিবারের স্ত্রী যদি অন্য কারও কাছে নিজের ক্ষণিক আশ্রয় খুঁজে পান, তাতে ক্ষতি কী। সত্যি কথা বলতে কী, এই রকম বালখিল্যতা প্রসূত প্রশ্ন কোনও

বিচারপতি তুলতে পারেন, তা বিশ্বাস করা যায় না। ক্ষণিক আশ্রয়ের খোঁজে স্ত্রী যদি একবারের জায়গায় বার বার পরকীয়ার আশ্রয় নেন তবে কি তাকেও বলা হবে নারী স্বাধীনতা? পরকীয়া বা ব্যভিচার কি মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে? আর ভারতীয় পরিবারগুলিতে সাধারণভাবেই নারীরা নিগৃহীত ও নির্যাতিত, এটা কোন সমীক্ষার সিদ্ধান্ত? এ ব্যাপারে বিচার ব্যবস্থা চুপ করে আছে কেন? নারীরাই বা গর্জে উঠছেন না কেন? এখানে পুরুষতন্ত্রের কুযুক্তি চলে না। কারণ, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বে বহু সংখ্যক নারী সুপ্রতিষ্ঠিত এই ভারতে। তাঁরা কেউ পুরুষতন্ত্রের শিকার নন। তাঁরা কেন এ ব্যাপারে নীরব? ব্যভিচারপন্থী নারী হিতৈষীরা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন কেন? কুযুক্তির সাহায্যে ব্যভিচারের পথকে সুগম করার ঠিকা তাঁদের কে দিল? তাছাড়া, পুরুষতন্ত্র থেকে বাঁচতে নারীকে কি ব্যভিচারতন্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে?

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ভারতের চরম দুর্ভাগ্যের দিন কোনটি— এই প্রশ্নের উত্তরে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বলেছিলেন— ''যেদিন কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, কুমারীরা বিবাহ ব্যতীত গর্ভধারণ কর্ব্বে, নারীজাতি সতীত্বের সুমহান আদর্শকে কুসংস্কার বলে ঘৃণা কর্ব্বে, সন্তানেরা জারজ বলে নিজেদিগকে পরিচিত কত্তে লজ্জাবোধ কর্ব্বে না, হীনচরিত্র নর-নারী প্রকাশ্যভাবে জনসমাজে পূজিত হবে, সেই দিনটা ভারতবর্ষের পক্ষে সব চাইতে দুর্ভাগ্যের দিন'' (অখণ্ড সংহিতা,-২/৩২)। তিনি আরও বলেছেন,— ''অনুন্নত সমাজে সতীত্বের আদরের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। উন্নত সমাজেই হয়। মানবের ভিতরের বহু-পরায়ণ পশুর ভাবকে বহু শতাব্দীর সংশোধনের মধ্য দিয়েই এক-পরায়ণ সতীত্ব মর্যাদায় এনে পৌঁছিয়েছে। অতএব এতদিনের অভিজ্ঞতার ফলকে আর্টের খাতিরে, সাহিত্যিকর্মের দোহাই দিয়ে কাব্য ফলাবার জন্যে বা পাশ্চাত্য জাতিদের সমকক্ষতার নাম করে জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না।'' ''যে দেশে বা সমাজে পুরুষ বা নারী মাত্রেই সুসংযত ও জিতেন্দ্রিয়, সেই দেশে বা সমাজে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কলহের অবসান আপনা আপনিই হয়ে যায়। এই জন্যই যাঁদের প্রদত্ত সৎ শিক্ষায় পুরুষ বা নারীদের ভিতরে সংযমের প্রেরণা জাগ্রত হয়, তাঁদের চেয়ে বড় সমাজহিতৈষী আর কেউ নেই। শাস্ত্রের অসংখ্য অনুশাসনের মধ্যে সেগুলিই জাতিগঠনের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক। যেগুলি পুরুষকে দিয়েছে সংযম, নারীকে দিয়েছে ধৈর্য আর উভয়কে দিয়েছে দেহের শুচিতা, মনের শুদ্ধতা ও আচরণের নিষ্কলুষতা।'' সুতরাং ''দেশ জুড়ে সর্বব্যাপক আত্মসংযমের সাধনাকে প্রচলিত করে তুলতে হবে। এই কাজে প্রত্যেকটি মানুষকে ব্রতী হতে বাধ্য কত্তে হবে। প্রতিটি মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, পশুরা মানুষ হতে হতে দেবত্বে উন্নীত হবার পথে ছুটেছিল কিন্তু আজ হঠাৎ তারা মুখ ফিরিয়ে উল্টো পতনের দিকেই গতিবেগ বৃদ্ধি করেছে। এই অবস্থার অবসান অবিলম্বে চাই।''

সুতরাং ব্যভিচার, সে যত ভালো নামেই সমাজে চলুক, তা ক্ষমার যোগ্য নয়। যে সকল আচার বা আরচণ প্রত্যক্ষভাবে ব্যভিচার না হলেও ব্যভিচারের দিকে নর-নারীকে ক্রমশ অগ্রসর করে থাকে, সে সকলকেই সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। পুরুষকে শিখাতে হবে, নারীর সতীত্বে হস্তক্ষেপ করার মতো পাপ নেই; নারীকে শিখাতে হবে, সতীত্বের দাম কমাবার মতো ভ্রম নেই। ব্যভিচারের প্রবণতা, প্রবৃত্তি, পরিস্থিতি এই তিনটাই নাশ করতে হবে। স্বাধীনতার নাম করে পুরুষ ও নারীরা ব্যভিচার করবে, এ যেন হতে না পারে। দুঃশীলতায় যে যুগে লজ্জা নেই, সে যুগ পশুর যুগ। কদাচারে যে দেশে ঘৃণা নেই, সেই দেশ সভ্য বলে পরিচয় দেওয়ার অযোগ্য। চিত্ত-দুর্বল নারী ও পুরুষেরা কেউ আর্টের নামে, কেউ স্বাধীনতা ও সাম্যের নামে, কেউ বা ধর্মের নামে যেসব অনুষ্ঠান করে, তার অধিকাংশই ব্যভিচারের দেয় প্রমতি। তাকে প্রগতি না বলে অগতি বা দুর্গতি বলাই উচিত। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,—''আশ্চর্যের বিষয় সকল ধর্মই সমস্বরে ঘোষণা করে, মানুষ প্রথমে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিল, এখন তাহার অবনতি হইয়াছে— এ ভাব তাঁহারা রূপকের ভাষায়, কিংবা দর্শনের সুস্পষ্ট ভাষায়, অথবা সুন্দর কবিত্বের ভাষায়, যেভাবেই প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহারা সকলেই কিন্তু ওই এক তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্র এবং সকল পুরাণ হইতেই ওই এক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্বে যাহা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অবনত হইয়া পড়িয়াছে।'' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২/১৭)।

যাই হোক, ব্যভিচারপন্থীরা না জানলেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা জানেন, মানুষের ভিতরের পশুটাকে ধ্বংস করার জন্য মানুষ আদিম যুগ থেকেই অফুরন্ত পরিশ্রম করেছে। ব্যক্তিগতভাবে এটা কারও কারও জীবনে সত্যই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রতিটি মানুষের জীবনে এটা সম্ভব হয়নি। তাই ভারতীয় সমাজের গঠনতন্ত্রের মধ্যে নানা বিধি-নিষেধের বেষ্টনি রচনা করে সর্বসাধারণের ভিতরের পশুটাকে শৃঙ্খলিত করে রাখার বা নিদ্রিত করার ব্যবস্থা করা রয়েছে। সুতরাং বর্তমানে যদি স্বাধীনতা, সাম্য ও আধুনিকতার নামে পরকীয়া বা ব্যভিচার তথা পশুত্বের জয়ধ্বনি দিয়ে তাকে আইনসিদ্ধ করার দুর্বুদ্ধি জাগে, তবে তা হবে ভারতের পক্ষে আত্মহত্যার শামিল, সন্দেহ নেই। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বাঙ্গালি বলতে কাদের বোঝায় : একটি সাম্প্রতিক বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালি পরিচয় নির্মাণ

নীল ব্যানার্জি

বিগত কয়েক দশক ধরেই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা অপচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাঙ্গালি পরিচয়টাকে গুলিয়ে দেওয়ার। এই প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশে। কেন এই প্রচেষ্টা? ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবিভক্ত বঙ্গে যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় তা থেকে অধিকাংশ বাংলাভাষী মুসলমান নিজেদের দূরত্ব বজায় রেখেছিল। মনে রাখতে হবে যে, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত ভারতবর্ষে মুসলিম লিগ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বাংলাভাষী মুসলমানরা। মুসলিম লিগের প্রথম সভাপতি ছিলেন ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহ। পরবর্তীকালে মহম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লিগ যখন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে (এই তত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি এবং তারা কখনই একত্রে বসবাস করতে পারে না) মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশ পাকিস্তান দাবি করে, তখনও প্রায় সমগ্র বাংলাভাষী মুসলমানই এতে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর তারা লক্ষ্য করে যে, উর্দুভাষী মুসলমানরাই সমগ্র পাকিস্তানে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। বাংলাভাষী মুসলমানদের পাকিস্তানে প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা হয়েছে। তখন নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে তারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তখনও পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশের কাছাকাছি অমুসলমান, তাই তাদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানরা বাঙ্গালিত্বের এই নতুন সংজ্ঞা জনপ্রিয় করে তোলে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলা ভাষায় যে কথা বলে সেই বাঙ্গালি। সেখানে যারা এতদিন মুসলমান বলে সগর্বে নিজেদের পরিচয় দিয়ে এসেছিল, যারা এতদিন বাঙ্গালিদের কাফের ও মালাউন বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত, ১৯৪৬-এর নোয়াখালি গণহত্যা এবং ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে যারা নির্বিচারে বাঙ্গালি হিন্দুদের হত্যা করেছিল, তারাও নিজেদের বাঙ্গালি বলে দাবি করতে থাকে নিছক বাংলাভাষায় কথা বলার সুবাদে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসে বাঙ্গালি ও মুসলমানদের একটি ফুটবল ম্যাচের কথা লিখেছেন। বামপন্থী সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'আমি কি বাঙ্গালি?' নামক বইটিতে উল্লেখ করেছেন যে, ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্তও বাংলার মুসলমানরা নিজেকে কেবলই মুসলমান বলেছে, আর হিন্দু প্রতিবেশীকে ডেকেছে বাঙ্গালি বলে। এর স্বপক্ষে তিনি একটি পুলিশ রেকর্ড উল্লেখ করেছেন

যেখানে বিংশ শতকের প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গের একদল বাংলাভাষী মুসলমান গ্রামবাসী এজাহার দিতে গিয়ে বলছে যে, এই গ্রামে মোট পাঁচ ঘর বাঙ্গালি, বাকি সব মুসলমান। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের আগমনের পর কয়েকশত বছর ধরে বাংলায় এটাই ছিল দপ্তর। যারা ভয়ে-ভক্তিতে বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তির কারণে (অধিকাংশই এই কারণে) আরবের মরুভূমিতে উদ্ভূত কাল্টটি গ্রহণ করতেন বা করতে বাধ্য হতেন তাদের বলা হতো মুসলমান এবং বাকি এই অঞ্চলে বসবাসকারী দেশজ সংস্কৃতি ও ধর্মাচরণে বিশ্বাসী মানুষদের বলা হতো বাঙ্গালি। এই তথ্যগুলি থেকেই এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাভাষী মুসলমানদের বাঙ্গালি বলার চল ছিল না (আর তারা নিজেরাও নিজেদেরকে বাঙ্গালি বলে পরিচয় দিতেন না) এবং ১৯৬০-এর দশক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে কী উদ্দেশ্যে বাংলাভাষী মুসলমানদের বাঙ্গালিত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যে দিয়ে নতুন বাঙ্গালি সংজ্ঞা নির্মাণ করার চেষ্টা করা হলো তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের কাছে পরিষ্কার।

তাহলে বাঙ্গালি বলতে আমরা কাদের বুঝব?

বাঙ্গালি হলো একটি ভাষা ও সংস্কৃতিগত পরিচয়। অর্থাৎ বাঙ্গালি হতে গেলে নিশ্চয়ই তার মাতৃভাষা বাংলা হতে হবে; কিন্তু শুধু ভাষা দিয়েই তার পরিচয় নির্ধারণ সম্ভব নয়। ভাষার ভিত্তিতে জাতির পরিচয় দিতে গেলে তো অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মানুষদেরও ব্রিটিশ বলতে হয়, যেহেতু তাদের মাতৃভাষা ইংরেজি। কিন্তু তারা আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান হিসাবেই পরিচিত হন। ঠিক একই যুক্তিতে কলকাতার কোনও বাঙ্গালি বালক-বালিকা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়ার ফলে বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে বেশি স্বচ্ছন্দ হলেও সে ইংরেজ হয়ে যায় না। তাছাড়া শুধুমাত্র ভাষার মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতির পরিচিতিকরণে আরেকটি সমস্যা আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলা ভাষা মোটামুটিভাবে ১০০০-১২০০ বছর পুরনো। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদও সমসাময়িক কালের। তাহলে ১০০০-১২০০ বছর আগে ভাগীরথী ও পদ্মার চারপাশে বসবাসকারী মানুষদের কি বাঙ্গালি বলা হবে না? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর কয়েক হাজার বছরের বঙ্গভূমির ইতিহাস সংক্রান্ত ক্লাসিক গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'বাঙ্গালির ইতিহাস : আদি পর্ব।' সুতরাং তিনি বাংলা ভাষার উদ্ভবের সঙ্গে বাঙ্গালি পরিচয় নির্মাণটাকে গুলিয়ে ফেলেননি।

ওপরের আলোচনাতেই পরিষ্কার যে বাঙ্গালি কারা বুঝতে গেলে ভাষা নয়, সংস্কৃতিগত পরিচয়ই আমাদের প্রধান মানদণ্ড হওয়া উচিত। বাঙ্গালি সেই যার কোনও ইন্ডিক নাম আছে, কোনও একটি ভারতীয় দর্শনে সে বিশ্বাসী, দুর্গা-কালী-সরস্বতীকে মাতৃরূপে উপাসনা করে (উত্তর চব্বিশ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ে ২৫০০ বছরেরও বেশি পুরানো যে প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে প্রাপ্ত বহু দেবী মূর্তি প্রমাণ করে যে বাঙ্গালি চিরকালই মাতৃপূজক বা শক্তির উপাসক), দেশীয় বেশভুষার প্রতি আস্থা আছে এবং কয়েক হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী এবং ভাগীরথী ও পদ্মার দুই তীরে কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

বাংলাভাষী মুসলমানদের কেন বাঙ্গালি বলা যায় না?

১। মুসলমানরা বাংলা বা কোনও দেশীয় ভাষায় নয়; মূলত অরবি বা পারসিতে নিজের সন্তানদের নামকরণ করে।

২। তাদের প্রথম কালেমায় আছে 'লা ইলাহা ইল্লালাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। অর্থাৎ ভারতীয় দেব-দেবী এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি তাদের মনোভাব সহজেই অনুমেয়।

৩। তাদের পোশাক-পরিধানে বোরখা-হিজাব-ফেজটুপি প্রভৃতি দেখা যায়, যার কোনোটাই ভারতীয় বা বাঙ্গালিদের ঐতিহ্যগত পোশাক নয়।

৪। মুসলমানরা ভারতীয় কোনও ধর্মসম্ভূত নয়, মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে উদ্ভূত কাল্ট বা রিলিজিয়নে বিশ্বাসী (প্রসঙ্গত বলা যায় যে ধর্ম ও রিলিজিয়ন এক জিনিস নয়। ধর্ম কিছু নৈতিকতার সমষ্টি, বৃহত্তর অর্থে জীবনচর্যা, যা রিলিজিয়নের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপ্ত)।

৫। বাংলাভাষী মুসলমানদের একটা অন্যতম প্রবণতাই হলো বাংলা ভাষার মধ্যে বেশি করে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ। যেটা অবশ্যই তাদের বাংলা ও বাঙ্গালি বিরোধী মানসিকতারই পরিচায়ক।

অধ্যাপক তমাল দাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে, সুনির্দিষ্ট হিন্দু সাংস্কৃতিক পরিচয় ছাড়া কোনও বাঙ্গালি পরিচয় অসম্ভব। বাঙ্গালি হিন্দু এই বাক্যবন্ধটি একটি পুনরুক্তি বা টটোলজি। বাঙ্গালি হতে গেলে বৃহত্তর অর্থে হিন্দু হতেই হবে, অন্যথায়, আপনি শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলেন, এ দেশের আবহমানকালের সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রায় আপনার অংশগ্রহণ নেই এবং বাঙ্গালি হিসাবে আপনি গণ্য হতে পারেন না।

এবার আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বাঙ্গালি হতে গেলে মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাঙ্গালি সংস্কৃতির অনুসারীও হতে হবে। আর এই বাঙ্গালি সংস্কৃতি বলতে ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-অনুষ্ঠান, পালা-পার্বণ সবই বোঝায়। সহজভাবে বললে হালখাতা, রথযাত্রা, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, ভাইফোঁটা, নবান্ন, সরস্বতী পূজা, চৈত্রসংক্রান্তি প্রভৃতি নিয়ে বাঙ্গালির যে বারো মাসে তেরো পার্বণ তা বাঙ্গালি সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে সমস্ত মানুষ বাঙ্গালির এই সংস্কৃতিকে অনুসরণ করেন বা পালন করেন বা এই ঐতিহ্যগত চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করেন তিনিই বাঙ্গালি। ■

চিঠিপত্র

এত বুকফাটা কান্নার উদ্দেশ্য কী?

আজকাল আমাদের দেশে যেটা বর্তমানে ঘটছে হয়-নয় কথাতেই নেতা-নেত্রীদের কান্নাকাটি শুরু। সবাই আবেগপ্রবণ কিনা। কিছুদিন আগে অসমে এন আর সি নিয়ে চলল রীতিমতো কান্নাকাটি। তারপর আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণের জন্য কী কান্নাকাটি। চোখের জল রাখা যায় না। মানুষের মৃত্যু বেদনাদায়ক এ কথা সত্যি, কিন্তু তাই বলে অযথা অশ্রু বিসর্জন যেন একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হলো। কিন্তু এ ব্যাপারে একটু তলিয়ে চিন্তা করলে তার উদ্দেশ্য কিছুটা পরিষ্কার হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভালো ছিলেন এ প্রসঙ্গ প্রশ্নহীন, কিন্তু উনি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন তো তাঁকে কাজ করার সুযোগ দেয়নি কেউ। এখন মৃত মানুষের প্রতি প্রশংসা-গীতি করে আরেকজনকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কথাটা বিশ্লেষণ করলে বোঝায়, তুই ভালো নয়, তোর বাপ খুব ভালো ছিল। একজনকে প্রশংসা করে আরেকজনকে প্যাঁক দেওয়া। এরপর নরেন্দ্র মোদী যখন থাকবেন না তখন নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় সবাই বুক চাপড়াবে। কিন্তু কেউই ভেবে দেখছে না এমন একজন প্রধানমন্ত্রীর পতন ঘটলে দেশের অবস্থাটা কী হবে। সবাই প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য পুঁটি মাছের মতো লাফালাফি করছে। কেউ চাইছে প্রধানমন্ত্রী না হতে পারি আর একজনের ভাত তো নষ্ট করা হবে। দেশের যা হয় হবে, একজন যাবে আর একজন আসবে। সবাই নোংরা রাজনীতি করছে। কেউই উন্নতি চায় না। সবারই ইচ্ছে লুটেপুটে খাব, পেটের ওপর হাত নাচিয়ে ডুগডুগি বাজাবো। মুসলমান সমাজের কিছু লোক বিজেপি বিরোধী দলকে ঢেলে ভোট দিচ্ছে। তাদের ইচ্ছে উন্নতি নয়, দেশটাকে পাকিস্তানের রূপ দেওয়া। কিছু নেতারও একই ইচ্ছে— মুসলমান ভোটের লোভে দেশটাকে যমালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। তাতে দেশ না থাকলেও চিন্তার কিছু নেই। ভোটে জিতে লুটেপুটে খাওয়া তাদের আসল উদ্দেশ্য। সেই জন্যই এত বুকফাটা কান্না বা চিৎকার।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর নদীয়া।

প্রসঙ্গ বন্দে মাতরম্

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীত জন্মলগ্ন থেকে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। ১৮৭৫ সালে ‘বন্দে মাতরম্’ প্রকাশিত হওয়ার পর এই সংগীতটি এগারো বছর পর বঙ্কিমচন্দ্র ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করেন। কাকতালীয়ভাবে ১৮৮৫ সালে অ্যালেন অক্টোভিয়ন হিউম নামে এক অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ন ওই বছর জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন মুম্বই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সংগীতটি কিছু অংশ গাওয়া হয়। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় দ্বিতীয় অধিবেশনে সংগীতটা গাইতে বাধা এল। কারণ জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য এসেছিলেন তৎকালীন ইংরেজ ভাবাপন্ন সমাজের উচ্চশ্রেণী থেকে। বছরের পর বছর তারা ইংরেজদের প্রতি অবিচল আনুগত্যের ধারা বজায় রাখতেন। আবেদন নিবেদনে তারা ব্রিটিশ শাসকদের সন্তুষ্ট করতেন। ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতটি যতটা প্রশংসিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে তৎকালীন বিদগ্ধ মহলে। বন্দে মাতরম্ সংগীতটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার পর সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের কোষাধ্যক্ষ এবং একাধারে সারাক্ষণের কর্মী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ‘উহা ভালো কী মন্দ এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে, আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভবনা, তুমি থাকিবে।’ ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ উদ্যোগে গানটি গেয়েছিলেন। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। জীবিতাবস্থায় তিনি দেখে যেতে পারেননি তাঁর সৃষ্ট ‘আনন্দমঠ’ ভারতের মুক্তিসাধনার বেদ স্বরূপ এবং দেশের সন্তানদের দৃষ্টি, চিত্ত প্রীতি ও সেবা আকর্ষণ করে ভারতমাতার মুক্তিসাধনায় বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুগযুগ ধরে বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের মহান সাফল্যে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিকদের একটা সফল অভ্যুত্থানের স্বপ্ন বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তৎকালীন বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিতজনেরা দ্বিধাগ্রস্ত মানসে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম্’ গানটি পরিমার্জনে ব্যস্ত ছিলেন। আবার সেই সঙ্গেই মুসলমান নেতৃত্বের আপত্তির সঙ্গে সহমত ছিলেন জাতীয় নেতৃবৃন্দের একাংশ। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে ১৯৩৯-এর ৩০ ডিসেম্বর তাঁর ভক্তসমীপে বলেছিলেন, ‘ভারতবর্ষের প্রাচীন থেকে এ পর্যন্ত যত কবিতা ও গান রচিত হয়েছে সেখানে রূপক বর্জিত কবিতা ও গান লিখিত আছে এরকম নজির আছে? বন্দে মাতরম্ সংগীতের দুর্গা ভারতমাতা, রাষ্ট্রীয় প্রতীক, মুসলমানরা তা গ্রহণ করবে না কেন?’ শ্রীঅরবিন্দের এই প্রশ্নের সামনে পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে কাণ্ডজ্ঞানহীন জাতীয় নেতারা ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদনে নিজেদের ক্ষমতালিপ্সার স্বার্থে ভাবীকালের কাছে একটা অনিশ্চিত সমস্যার চিত্রপট রেখে গেলেন। আজ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে বারবার দেশপ্রেম পরীক্ষিত হচ্ছে।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

গদি মাহাত্ম্যের লীলাখেলা

জাতীয়তাবাদী স্বস্তিকা পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠা আমার মনোহরণ করেছে। এমন একটি পত্রিকার বড়ো প্রয়োজন এই দুর্দিনে। চরিত্র গঠন ও মানুষের বিবেক সঞ্চারী এই পত্রিকা প্রতিটি গৃহে পঠিত হওয়া উচিত। দেশ আজ

রসাতলে যেতে বসেছে উচ্চাদর্শের অভাবে।

৮৮ বছর বয়সে মনের দুঃখে এই চিঠি লিখছি। নেতাজীর মূর্তি সরিয়ে জওহরলালের মূর্তি বসানো হয়েছিল। নেতাজীর ঘোড়ায় চড়া মূর্তি শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে বসানো হলো।

রাস্তার নাম দেওয়া হলো জওহরলাল নেহরু রোড। দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় মরে যাই। কার সঙ্গে কার তুলনা! গদিতে বসলেই কি খলনায়ক কংস ভগবান হয়ে যায়? হায় গদি! বর্তমানে গদি মাহাত্ম্যের লীলাখেলা দেখছি। আর কত দেখতে হবে।

১৯৩৯-এ আমার ন' বছর বয়সে সুভাষচন্দ্রের গলায় মালা পরিয়ে দেবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা জওহরলালের মূর্তি সরিয়ে সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশাল মূর্তি বসানো হোক। আর রাস্তার নাম দেওয়া হোক বন্দে মাতরম্ সরণি। তবেই যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হবে। মৃত্যুর পূর্বে এটা দেখে যেতে চাই। তাহলে প্রাণে শান্তি পাব।

—যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার,
কলকাতা-১১৫।

একতরফা সম্প্রীতি

হিন্দুতীর্থ তারকেশ্বর। প্রতিবছর বৈশাখ, শ্রাবণ ও চৈত্র মাসে তীর্থযাত্রীরা বাঁকে করে জল নিয়ে বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালার জন্য পায়ে হেঁটে যায়। সেই হিন্দুতীর্থ তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের মন্দিরের ট্রাস্টির উপর রাজ্য সরকারের তরফে একজন বিধর্মী ফিরহাদ হাকিমকে বসানো হলো? কোনো সৎ ধার্মিক হিন্দুর কি রাজ্যে এতই অভাব হয়েছে? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা কি শুধু হিন্দুরাই বলবে? মেকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ রাজ্য সরকার কি কোনো ব্রাহ্মণকে কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের কর্মসমিতির প্রধান হিসেবে বসাতে পারবে? পারবে না। কারণ সেই কলিমুদ্দিন সামসের কথা, 'আমি প্রথমে মুসলমান তারপর ভারতীয়'। শুধু তাঁর কথা নয়, এটা হলফ করে বলা যায় এটা প্রায় প্রতিটি মুসলমানের অন্তরের কথা।

আমাদের নেত্রী ইদের দিন মোনাজাত করে দোয়া মাঙতে পারেন, ইফতার করতে পারেন, কিন্তু মুসলমানদের নিয়ে নামাবলী গায়ে দিয়ে বিজয়া দশমীতে কোলাকুলি করতে পারবেন না। কারণ তারা সকলে প্রথমে মুসলমান তারপর পশ্চিমবঙ্গবাসী। সকলের মনে থাকতে পারে কোনো এক নির্বাচনের প্রাক্কালে বামফ্রন্টের সেলিম শ্রীরামপুরে বজরঙ্গবলীর পূজার স্নানজল পান করাকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজ ক্ষেপে ওঠেছিল। নেত্রীর উদ্দেশ্যে বলা যায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভালো, সেটা যেন দু' সম্প্রদায়ের মানুষের ভাগেই পড়ে। ম্যাডামের চেয়ারটি আগে না পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থরক্ষা আগে? ভাবার সময় আছে, ভেবে নিন।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী, বর্ধমান।

'পতত্বেষকায়ো নমস্তে নমস্তে'

গত ১৪ আগস্ট গড়িয়া থেকে যাদবপুর তিরঙ্গা যাত্রায় বেরিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা শক্তিশেখর দাস। রোদের মধ্যে শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জনতাকে জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীগুরুজী বলেছেন 'আত্মবিস্মৃতিই আমাদের পতনের কারণ।' এই আত্মবিস্মৃতি ঘোচাবার অদম্য উৎসাহে ভারতমাতার বীর সন্তান শক্তিশেখর দাস বীরগতি প্রাপ্ত হলেন। এ যেন প্রার্থনায় উল্লিখিত সেই বাক্য 'পতত্বেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে।' কেরলে বন্যাদুর্গতদের উদ্ধারকাজে নেমে ৯ জন স্বয়ংসেবকও বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা জলে নেমে উদ্ধারকার্য চালাচ্ছেন তাঁদের সেবাকাজ ও আত্মত্যাগের কথা এখানকার বিকৃত সংবাদমাধ্যম বেমালুম চেপে যাচ্ছে। জনসাধারণকে আজ মিথ্যা সংবাদে অপপ্রচারে বিভ্রান্তিতে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেশের পক্ষে এটা ভীষণ বিপদ।

—প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,
পাটুলি, কলকাতা-৯৪।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ও কিছু কথা

ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। এবার পশ্চিমবঙ্গে যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল তাতে প্রায় কুড়ি হাজারেরও বেশি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে। এক্ষেত্রে শাসকদলের যুক্তি হলো বিরোধীরা কোনও প্রার্থী দিতে পারেনি। এছাড়াও তারা অন্যান্য বেশ কিছু রাজ্যের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের উদাহরণ আদালতের সামনে পেশ করেছেন। এখানেই আমার প্রশ্ন। মনে রাখতে হবে যে, অন্যান্য রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন চারিত্রিক ও মানসিক দিক থেকে অনেকটাই আলাদা। বাংলার মানুষ প্রত্যেকটা নির্বাচনকে খুব গুরুত্ব দেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে আরো বেশ। সেখানে সেই আসনগুলিতে বিরোধীরা কোনো প্রার্থী খুঁজে পায়নি এটা মেনে নিতে শুধু কষ্ট নয়, বেশ লজ্জা লাগে। কারণ যেভাবে শাসকদল বিরোধীদের মনোনয়ন পেশ করতে বাধা দিয়েছিল, হুমকির সঙ্গে সঙ্গে গুলি বোমা চালিয়েছিল তাতে এই রাজ্যের গণতন্ত্রকে হত্যা করে চিতায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আমার মনে হয় না অন্যান্য রাজ্যে এভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করে বিরোধীদের মনোনয়ন পেশ করতে বাধা দেওয়া হয়। তাই পুনরায় বিচার ব্যবস্থাকে সম্মান দিয়ে বলছি— বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে না কী?

—নরেশ মল্লিক,
পূর্বস্থলী-২, পূর্ব বর্ধমান।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন, ২০০৫

মহিলারা কী কী সুবিধা পেতে পারেন

সৌমী দাঁ

আগের পর্বে গার্হস্থ্য হিংসা আইন কী এবং কোন কোন কাজ বা কী ধরনের পারিবারিক হিংসা এই আইনের আওতায় আসবে তার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। কারা এই আইনের সুবিধা পেতে পারেন ও মামলার জুরিসডিকশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আজকের পর্বে এই আইনে মহিলারা কী কী সুবিধা পেতে পারেন, কীভাবে বিচার নিষ্পত্তি হয় তাই আলোচনা হবে। এই আইনে শাস্তির বিধান নিয়েও আলোচনা হবে।

এই নতুন আইনে বধূরা তো বটেই, এছাড়া মা, অবিবাহিতা বোন, বিধবা বৌদি, সকলেই সুরক্ষা পাবেন। শুধু তাই নয়, যাঁরা লিভ্-ইন রিলেশন-এ আছেন বা যে মহিলারা প্রেমিকের সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন তাঁরাও নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পাবেন। প্রেমিকা যদি মনে করেন যে, তিনি তাঁর প্রেমিক দ্বারা প্রতারিত ও মানসিক বা শারীরিক ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন, তবে তিনি অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তিও হবে।

এই আইনের একটা বৈশিষ্ট্য :

আমাদের দেশে এখনো অধিকাংশ মহিলা স্বনির্ভর বা স্বাবলম্বী নন। মহিলারা নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেন। আবার আর্থিক ভাবে দুর্বল হলেও ভাবেন আইনের সাহায্য কীভাবে নেবেন, মামলা চালাবেন কীভাবে?

সেই রকম সহায় সম্বলহীন মহিলা যারা আর্থিকভাবে দুর্বল তাদের জন্য আছে 'The Legal Services Authorities Act'. এটিকে লিগাল এইড অফিসও বলা যেতে পারে। প্রতিটি জেলা আদালতে এরকম অফিস থাকে। অসহায় মহিলা এর দ্বারস্থ হলে বিনা খরচে আইনি সহায়তা পরামর্শ পাবেন।

অভিযোগকারিণী ও অভিযুক্তের মধ্যে অন্য এক বা একাধিক মামলা চলাকালীন এই আইনের বলে সুবিধা কী অভিযোগকারিণী বা নির্যাতিতা পেতে পারেন—

যদি কোনও মহিলা অন্য আইনে নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে মামলা করে থাকেন তাহলেও সেই মামলা চলাকালীন অবস্থায়ও তিনি যদি মনে করেন তিনি পারিবারিক হিংসার শিকার, অবশ্যই তিনি এই আইনে সাহায্য পাবেন।

অঙ্গনা

এই আইনে মহিলারা বিভিন্ন সুরাহা ও আর্থিক সুরাহা বা ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।

আইনে 'রেসিডেন্স অর্ডার' বলে একটি কথা আছে। যেসব মহিলা অত্যাচারিত হয়ে বাসস্থান ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন বা বিতাড়িত হয়েছেন এই, 'রেসিডেন্স অর্ডার'-এর মাধ্যমে আদালত তাদের বসবাসের সুরাহা করবে। যে বাড়িতে তিনি বাস করছেন সেখান থেকে কেউ তাকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করতে পারবে না। বরং আদালত চাইলে নির্যাতনকারীকে অন্যত্র থাকার নির্দেশ দিতে পারে। নির্যাতনকারীকে নির্দেশ দিতে পারে যাতে নির্যাতনকারী তার অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করে নিজের খরচায়। মেয়েটি যাতে সুরক্ষিত ভাবে বসবাস করতে পারে সেই সব সুবিধাই এই আইনে দেওয়া হয়।

অনেক সময় দেখা যায় নির্যাতনকারী নির্যাতিতা মহিলাকে বিতাড়িত করে বাড়ি বিক্রি করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই আইনে আদালত সেই বিষয়ে স্থগিতাদেশ দিতে পারে এবং নির্যাতিতাকে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা করতে পারে। সেই বাড়িতে নির্যাতিতার মালিকানা থাক বা না থাক।

এই আইনে আর্থিক সুরক্ষা সংক্রান্ত আদেশ :

এই আইন অনুযায়ী একজন মহিলা আদালত থেকে যে যে আদেশ পেতে পারেন সেগুলি হলো—

(১) মানসিক অত্যাচার এবং আবেগজনিত বিপর্যয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।

(২) নির্যাতনকারী যদি তার কোনও শারীরিক ক্ষতি করে থাকে তাহলে নির্যাতিতা আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।

(৩) নির্যাতিতার যদি কোনও সন্তানাদি থাকে তাহলে নিজের ও সন্তানদের জন্য খোরপোশ বা ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।

(৪) নির্যাতিতা যদি আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন নির্যাতনকারীর দ্বারা বা তার রোজগার বা চাকরির ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলেও আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে।

(৫) নির্যাতনকারী যদি নির্যাতিতার সম্পত্তির ক্ষতি করে তাহলেও ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।

(লেখিকা পেশায় আইনজীবী)

বহু গুণসম্পন্ন কুমড়োর বিচি

পরিমল কুণ্ডু

অনেক সময়ে ভিটামিন বি-এর ঘাটতি পুরণে কিংবা মুখরোচক স্ন্যাক্স হিসাবে কুমড়োর বিচি খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। ১০০ গ্রাম কুমড়োর বিচিতে থাকে ৫৬০ ক্যালরি। যা খেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি থাকার একটা অনুভূতি থাকে। প্রাকৃতিক পুষ্টি উপাদানে 'পাওয়ার হাউস' বলে পরিচিত মিষ্টি কুমড়োর বিচিতে রয়েছে ভিটামিন বি, ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটিন, আয়রনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব পুষ্টি উপাদান। এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক মিষ্টি কুমড়োর বিচির নানা গুণ—

(১) **হার্ট ভালো রাখে :** কুমড়োর বিচি এমন একটি খাদ্য উপাদান যার মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, ফাইবার ও উপকারী ফ্যাটি অ্যাসিড। এগুলি নানাদিক থেকে হার্টকে সুরক্ষা দেয়। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ফ্রি র‍্যাডিক্যালস ঝরিয়ে হার্টকে রাখে সুস্থ। এছাড়া ফ্যাটি অ্যাসিড রক্তের খারাপ কোলেস্টেরল এলডিএলের পরিমাণ কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরল এইচ ডি এলের পরিমাণ বাড়ায়। ম্যাগনেসিয়াম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে হার্টের উপর চাপ পড়ে না, স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

(২) **ভালো ঘুমের জন্যও উপকারী :** কুমড়োর বিচিতে ট্রিপটোফ্যান নাম একটি উপাদান আছে, যা মস্তিষ্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিউরোট্রান্সমিটার সেরাটোনিনের নিঃসরণ বাড়ায়। সেরাটোনিন ভালো ঘুম হওয়ার জন্য দায়ী। তাই তো ইদানীংকালে গবেষকরা বলেন, রাতে ঘুমানোর আগে মুঠোভর্তি করে কুমড়োর বিচি (সামান্য তেলে নুন দিয়ে নাড়লে খেতে ভালো লাগবে) খেলে সাউন্ড স্লিপ হয়।

(৩) **রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়ায় :** কুমড়োর বিচিতে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটোকেমিক্যালস, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে চাঙ্গা করে। ফলে, সিজনাল ফ্লু, ভাইরাল জ্বর, সর্দি, কাশি, সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে। এক কথায় ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর কুমড়োর বিচি।

(৪) **জ্বালাপোড়ার কষ্ট কমায় :** বাতের ব্যথা, জয়েন্ট পেইন, পেশির জ্বালাপোড়ার অনুভূতি কমাতে কুমড়োর বিচি খুবই কার্যকরী।

(৫) **ডায়াবেটিস রোগীদেরও পক্ষেও উপকারী :** কুমড়োর বিচি শরীরে নিয়মিত ইনসুলিন সরবরাহ করে ও ক্ষতিকর অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। এছাড়াও পরিপাক ক্রিয়া সহজে হতে সাহায্য করে। এর ফলে রক্তে অযথা শর্করার পরিমাণ বাড়তে পারে না।

(৬) **প্রোস্টেটের সুরক্ষা দেয় :** কুমড়োর বিচিতে থাকে গুরুত্বপূর্ণ মিনারেল জিংক, যা সার্বিকভাবে পুরুষত্বের ধারা বাড়ানোর পাশাপাশি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রোস্টেটের সুরক্ষাপ্রদানকারী হিসাবেও কাজ করে। বিচিতে থাকা ডি এইচ ও (ডাই হাইড্রো এপি অ্যান্ড্রোস্টেনেডিয়ন) প্রোস্টেট ক্যানসারকে দূরে রাখে।

(৭) **রক্তাল্পতা কমায় :** কুমড়োর বিচিতে যে আয়রন আছে, তা আগেই বলেছি। ফলে যাঁরা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে ভুগছেন, তাঁরা ওষুধের পাশাপাশি নিয়মিত কিছুটা করে কুমড়োর বিচি একটু ভেজে, স্যুপে বা স্যালাডে দিয়ে খেলে উপকার পাবেন।

(৮) **স্থূলত্ব দূর করতে :** এতে থাকে পরিমিত মাত্রার ফাইবার ও ক্যালোরি। ফলে এটি হজম হতে সময় নেয়। পেট অনেকক্ষণ ভর্তি থাকে। ফলে বাড়তি খাবার খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ■

ইউপিএ আমলে গ্রেপ্তারের সময় যাঁরা মুখ খোলেননি, তাঁরাই আজ মুখর কেন?

দীপক কুমার ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ-নেপাল সীমান্তে নকশালবাড়ি থানার কয়েকটি গ্রামে জোতদারদের জমি দখলের যে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল আজ থেকে ৫১ বছর আগে, তা শুরু করেছিলেন সিপিএমের লাল কার্ডধারী সদস্য কানু সান্যাল, সৌরেন বোস, জঙ্গল সাঁওতাল, খোকন মজুমদারেরা। চারু মজুমদার তখন শিলিগুড়িতে শয্যাশায়ী অবস্থায়ই তাঁর ৮ দলিল রচনায় ব্যস্ত। এঁরা সবাই সিপিএমের জেলা কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

কানু স্যানাল দু'বারের চেষ্টায় টেনেটুনে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ম্যাট্রিক পাশ করবার পরই মদ-গাঁজা-চরসে মাদকাসক্ত। চারু মজুমদার আই. এ. পরীক্ষার টেস্টেই ফেল। খোকন মজুমদার তো নিজেই জোতদার, আর সৌরেন বোসও ম্যাট্রিক পাশ করে শিলিগুড়িতে এক মোটরগ্যারাজে খাতা লিখতেন।

স্বাধীনতার আগে আগস্ট আন্দোলনের সময় ইংরেজদের ঘোষিত সহযোগী, হিটলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় যখন বোকার মতো ব্রিটেন জয় অসমাপ্ত রেখেই রাশিয়া আক্রমণ করলেন, তখন 'সাম্রাজ্যবাদী' যুদ্ধ সিপিআইয়ের বিবেচনায় হয়ে গেল 'জনযুদ্ধ'। নেতাজী সুভাষ হয়ে গেলেন 'তোজোর কুকুর'। বড় আশা করেছিল সিপিআই যে, স্ট্যালিনের কথায় ব্রিটিশরা যুদ্ধের পরে দিল্লির সিংহাসনে সিপিআইকেই বসিয়ে যাবে। এই স্বল্পবুদ্ধি মহাবিপ্লবীরা বুঝতেই পারেনি, ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী হিটলারের চেয়েও বেশি ঘৃণা করে কমিউনিস্টদের।

'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে কলকাতার রাজপথে তখন সিপিআইয়ের মিছিলে ২০/২৫ জনের বেশি লোক হতো না। তারপর আবার শহরতলির কারখানা থেকে গায়ে লাল-জামা, হাতে লাঠি শ্রমিকদের এনে ডালহৌসি এলাকায় সাহেবি কোম্পানির সদর দপ্তরে হাঙ্গামা করবার দায়ে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় যখন ১৯৪৮ সালে দোলের দিন পার্টিটাকেই বে-আইনি ঘোষণা করে সব পার্টি-অফিসে তালা মেরে দিয়ে অধিকাংশ নেতাকেই জেলে পুরে দিলেন, তখন সব বিপ্লব শেষ। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশের সংবিধান লাগু হবার পরে পার্টি আবার আইনি বাধামুক্ত হয়ে সবে যখন আড়মোড়া ভাঙছে, তখন সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব-পাকিস্তানে বীভৎস হিন্দু-নিধন যজ্ঞ। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের প্রচেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রী যখন আন্দামান ও দণ্ডকারণ্যে আরও ২টি বাংলা-ভাষাভাষী রাজ্য গঠনে ব্যস্ত, তখন জ্যোতি বসুরা উত্তরে দমদম থেকে কাঁচড়াপাড়া এবং দক্ষিণে যাদবপুর, টালিগঞ্জ থেকে বারুইপুর-বাসন্তী পর্যন্ত জোর করে জমি দখল করে উদ্বাস্তুদের সেখানেই পুনর্বাসনের নামে চির-ভিখারি বানিয়ে কলোনিগুলিতে নিজেদের ভোটারের সংখ্যা বাড়াতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল।

এই হতদরিদ্র উদ্বাস্তুদের দিয়েই তাঁরা ১৯৫৩-তে ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সশস্ত্র ও নাশকতাপূর্ণ আন্দোলন, ১৯৫৪-তে শিক্ষক-আন্দোলন, ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত লাগাতার খাদ্য- আন্দোলনের নামে রাজ্যের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ব্যস্ত ছিল। ১৯৪৯-এর আগস্ট মাসের ৩১ তারিখে খাদ্য-আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ, ১ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলিবর্ষণ। ততদিনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী

ভারভারা রাও

বামপন্থী তাত্ত্বিক মহলে ভারভারা রাও বিখ্যাত ব্যক্তি। কবি এবং সাংবাদিক ভারভারা রাওকে মাওবাদী আদর্শের প্রচারক হিসেবে ধরা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা ভারভারা বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। জেলও খেটেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এর জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত বীরাসম নামক সংস্থাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অন্ধ্র সরকার এবং ২০০৫ সালের ১৯ আগস্ট তিনি গ্রেপ্তার হন। মনমোহন সিংহের সরকার যে ১২৮টি মাওবাদী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল তার মধ্যে ভারভারার বীরাসমও ছিল। অভিযোগ একই, অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম। জরুরি অবস্থার সময়েও জেল খেটেছেন ভারভারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাওবাদী জঙ্গিনেতা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষণজী মারা যাওয়ার পর এই ভারভারা রাও এসেছিলেন মৃতদেহ অন্ধ্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন উত্তেজক বক্তৃতাও। সম্প্রতি দুটি চিঠির ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র পুলিশ ভারভারাকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের দাবি, ভারভারা এবং তার সঙ্গীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'রাজীব গান্ধীর স্টাইলে' হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

পরিকল্পনার সাফল্যে খাদ্যাভাব মিটে গেছে। ৭ বছর এরকম দমনপীড়নের পর কমিউনিস্টদের আন্দোলনের ডাকে রাস্তায় লোক জড়ো করবার ক্ষমতা কমে গিয়েছিল।

১৯৬২-তে চীনের ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশবাসী একজোট হলেও, সিপিআই দুই ভাগ হয়ে গেল। জ্যোতি বসু বললেন, ''হিমালয়ের ওই উঁচুতে কে কাকে আক্রমণ করেছে তা কী করে বলবো? ১৯৬৪-তে পার্টি দু' ভাগ হলো। এতেও আরবান নেতারা থামলেন না। সিপিএমের কতিপয় সাংবাদিক (সরোজ দত্ত), অধ্যাপক সুশীতল রায়চৌধুরী, সুনীতি ঘোষ, শ্যামল ঘোষ, নিশীথ ভট্টাচার্য ও কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা (সাধন সরকার) পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে এসে সিপিআই (এম এল) তৈরি করবার কাজ শুরু করলেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেন জ্যোতি বসু স্বয়ং। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারে (১৯৬৯-৭০) উপমুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েই তিনি মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির তীব্র আপত্তি অগ্রাহ্য করে জেলে বন্দি কানু সান্যাল-সহ সব গ্রামীণ নকশালদের মুক্তি দিলেন। কানু সান্যালকে সামনে রেখে, আট দলিলের লেখক চারু মজুমদারকে প্রধান করে ১ মে, ১৯৬৯ মনুমেন্ট ময়দানে নকশালদের পার্টি সিপিআই (এম এল)-এর জন্ম হলো। সিপিএমের 'মে' দিবসের মিছিল আক্রমণ করে সদ্য জন্মানো পার্টি তার আগমনবার্তা ঘোষণা করলো। ব্যস, জুটে গেল কিছু 'চিরকাল ছাত্র নেতা' অসীম চ্যাটার্জির মতো যুবক।

''বুর্জোয়ার রক্তে হাত না রাঙালে বিপ্লবী কমিউনিস্ট হওয়া যায় না''— মাও-সে-তুঙ, তখনও তিনি মাও-জে-দঙ্ হননি— তাঁর এই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন নকশাল পার্টি, শহরেই খতমের রাজনীতি শুরু করলো। নৃশংসভাবে খুন হলেন নেতাজীর সহকর্মী হেমন্ত বোস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেন, হাইকোর্টের বিচারপতি এন এল রায়, বিচারসচিব রাজারাম বিশ্বাস, প্রায় ২০০ পুলিশ এবং ১ হাজারের উপর সাধারণ মানুষ। নেতারা শহরেই গোপন আস্তানা গড়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। গ্রামাঞ্চলেও জোতদার, বড় ব্যবসায়ী খুন হতে লাগলো।

এখন এক বাজারি পত্রিকা গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক স্বার্থে সদ্য প্রকাশিত হয়েছে অসীম চ্যাটার্জির সহকারী সন্তোষ রানার বই 'রাজনীতির একজীবন'। মামুলি বইয়ের বিক্রি বাড়ানোর জন্য তাঁকে একটি পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে ঘটা করে। তিনি স্বীকার করেছেন, নকশাল হতে গিয়ে তিনি বিয়ে করবার সময় পাননি, তবে একাধিক মহিলার সঙ্গে ঘর করেছেন, মেয়েও হয়েছে। তিনি যে সরাসরি অন্তত দু'টি খতমের ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেছেন, পুলিশ অবশ্য আদালতে যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি, তাই তিনি দু'বারই ছাড়া পেয়ে গেছেন। খুনের ঘটনা তামাদি হয় না। তৃণমূল সরকার অবশ্য তাঁকে ছেড়ে রেখেছে।

সে সময়ের আরবান নকশাল নেতারা নিজেদের মধ্যে খেয়েখোয়ির কথা পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে বিস্তারিত বলেছেন। সুনীতি ঘোষ চারু মজুমদারকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কেন তাঁকে খুন করতে চাইছেন? জবাব দেবার আগেই পেথিড্রিন-আসক্ত চারু মজুমদার নিজেই ধরা পড়ে পুলিশ হাজতে পেথিড্রিন না পেয়ে সাত দিনেই পটোল তুললেন।

সিদ্ধার্থ রায়ের পুলিশ (১৯৭১-৭২) উচ্চতম নেতৃত্বের সংকেত পেয়ে তিন মাসের মধ্যে আরবান নকশালদের জেলে বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু জ্যোতি বসুর প্রথম বামফ্রন্ট সরকার (১৯৭৭) আবার সবাইকে ছেড়ে দিল। এখন সেই সিপিআই (এম এল) শতধাবিভক্ত, কোনও কোনও পার্টিতে আছে স্ত্রী, স্বামী ও পরিবারের এক বন্ধু (কমিউনিস্ট পার্টি অব ভারত)।

সিপিএমই নকশালবাড়ির পরিকল্পনা করেছিল। ১৯৬৬-র খাদ্য ও কেরোসিন আন্দোলন প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সরকারকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী অজয় মুখার্জির বাংলা কংগ্রেসকে প্রত্যক্ষ সমর্থন ও প্রচ্ছন্ন মদত দিয়ে প্রফুল্ল সেন ও কংগ্রেসকে হারিয়ে দেন। সিপিএম ভেবেছিল, আসন সংখ্যা কমলেও ১৯৬৭ সালের নির্বাচন কংগ্রেসই আবার ক্ষমতায় আসবে। নির্বাচনের দু' সপ্তাহ আগে ডি আই জি, আই বি বিষ্ণু বাগচী প্রতি জেলার এস পি-দের সিপিএমের প্ল্যান সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

দার্জিলিংয়ের এস পি শোনেননি। তাই নকশালবাড়ি ঘটে গেল। ২৪ মে নিরস্ত্র পুলিশ ইন্সপেক্টর সোনাম ওয়াংদিকে তির দিয়ে মেরে কানুবাবুদের বিপ্লব শুরু হলো। পরদিনই পুলিশের গুলিতে ১১ নকশালের প্রাণ যেতেই আন্দোলনের বারোটা বেজে গেল। দু' মাসের মধ্যেই প্রায় সব নেতা জেলে। ১৯৬৯-এর ১ মে আরবান নকশালদের উদ্যোগে সিপিআই (এম এল) গঠিত হবার পরে ৫০ বছরেও নকশালবাড়িতে একদিনও গণ্ডগোল হয়নি।

মূলত অন্ধ্রের আরবান নকশালদের উদ্যোগে গঠিত কিষেণজীর জনযুদ্ধ বাহিনীকে ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে ডেকে এনেছিল সিপিএম তৃণমূলকে ঠেকাতে। কাজ উদ্ধার হতেই, সিপিএম তাদের হঠানো শুরু করতেই 'লালগড়' শুরু হলো। ততদিনে অন্ধ্র, ছত্তিশগড় ও বিহারের মাওবাদী কো-অর্ডিনেশন জনযোদ্ধাদের সঙ্গে মিশে তৈরি হয়েছে সিপিআই (মাওবাদী)। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ডে সক্রিয় হয়েছে মাওবাদীরা।

অস্ত্রচালনায় সুশিক্ষিত কম্যান্ডারেরা কাজ করে মাওবাদী পলিটব্যুরোর নির্দেশে। গরিব, রোজগারহীন উপজাতি যুবক-যুবতীরা তাদের ফুট-সোলজার, উন্নতমানের চীনা অস্ত্রশস্ত্র আসে নেপাল, মায়ানমার, বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে।

শহরে মদত দিচ্ছে আরবান মাওবাদীরা। ইউ পি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহও মৌন ভেঙে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, ''মাওবাদীরাই ভারতের এক নম্বর অভ্যন্তরীণ শত্রু।'' সেই আমলেই মাওবাদীরা ছত্তিশগড়ে সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগেই ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ জননেতা— যাঁদের মধ্যে তদানীন্তন প্রদেশ সভাপতি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা ও ছত্তিশগড়ের এক মন্ত্রীও ছিলেন, তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।

আজ যে ৫ জন তথাকথিত নিরীহ সমাজকর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৩ জন কংগ্রেস আমলেও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তখন বিজেপি কেন, জে এন ইউ ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বামপন্থী অধ্যাপক ও কিছু তথাকথিত বামপন্থী সমাজকর্মী ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল একটি কথা বলেনি।

কংগ্রেসের অপরিপক্ক নেতা রাহুল গান্ধী ও অন্যরা এখন প্রতিবাদ করছেন, তারা তো একটি কথাও বলেননি। যখন মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকার ২০০৭ সালে একই অভিযোগ ভার্নন গঞ্জালভেসকে গ্রেপ্তার করেছিল কংগ্রেস এন সি পি জোট সরকারের আমলে ২০১৩ সালে সাজাও দিয়েছিল।

তাঁদের সমর্থনে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন আই এ এস অরুণা রায়, যিনি ইউ পি এ আমলে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে গঠিত পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য ছিলেন। মুখ খুলেছেন প্রাক্তন আই এ এস জহর সরকার। তিনি চেয়েছিলেন বিজেপি সরকার তাঁকে প্রসার ভারতীর চেয়ারম্যানের পদে বহাল রাখুক। যে রোমিলা থাপার ইউ পিএ আমলে এদের গ্রেপ্তারের সময় মুখ খোলেননি, আজ তিনিও মুখর।

এসব আরবান নকশালদের টাকা জোগায় মাওবাদীরা। খনিমালিক, বন ও সড়ক দপ্তরের ঠিকেদারেরা মাওবাদীদের নিয়মিত টাকা দেয়। তাঁর ভগ্নাংশ দিয়েই জঙ্গলের মাওবাদীরা আরবান মাওবাদীদের পোষে। এরা কেউ অধ্যাপক, কেউ লেখক, কেউ কংগ্রেস আমলে ক্ষমতাশালী এমন অবসরপ্রাপ্ত আমলা আর তথাকথিত সমাজকর্মী। টাকার জোগান বন্ধ হলেই আরবান নকশালেরা আর থাকবে না।

সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু ধৃত পাঁচ আরবান নকশালকে মুক্তি দেয়নি। সরাসরি গ্রেপ্তার করে হাজতে না রেখে নিজ নিজ বাড়িতে অন্তরীণ করে রেখেছে, যাতে পুলিশ তাঁদের প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। মহারাষ্ট্র পুলিশ কাগজপত্র দেখিয়ে এঁদের সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে। আরও অনুসন্ধান চলবে। আশা করা যায়, মহারাষ্ট্র পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করতে পারবে।

এসব আরবান নকশাল, যাঁদের কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সবকিছু দিয়ে সমর্থন করে, আইনের ফাঁক গলে ছাড়া পেয়ে গেলে দেশের পক্ষে সমূহ বিপদ।

(লেখক প্রাক্তন আই এ এস এবং প্রাক্তন বিধায়ক)

গৌতম নওলখা

গৌতম নওলখা মাও-আদর্শে অনুপ্রাণিত পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রাটিক রাইটসের সঙ্গে যুক্ত। পেশায় তিনি দিল্লিস্থিত সাংবাদিক। বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাপ্তাহিকে কলাম লেখেন। সম্প্রতি তিনি আনলফুল অ্যাকটিভিটিজ অ্যাক্ট ১৯৬৭-র প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন। তাঁর দাবি, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার এই আইনকে ব্যবহার করে। উল্লেখ্য, মাওবাদী জঙ্গি আন্দোলন-সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করতে এই আইন পুলিশের মস্ত বড়ো হাতিয়ার। গৌতম নওলখা একজন মানবাধিকার কর্মীও। জম্মু ও কাশ্মীর তার কর্মক্ষেত্র। এ ব্যাপারেও তিনি বিতর্কে জড়িয়েছেন। ২০১১ সালে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ তাকে শ্রীনগর এয়ারপোর্টে আটকে দিয়েছিল। পুলিশের অভিযোগ ছিল, 'গৌতম নওলখা কাশ্মীরে ঢুকলে সেখানকার শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে।' ফারুক আবদুল্লা বলেছিলেন, 'উনি কি কাশ্মীরে আগুন জ্বালাতে চান?' এর থেকে পরিষ্কার মানবাধিকারের নামে গৌতম নওলখার মতো নেতারা কী ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত।

শহুরে নকশাল নকশালের চেয়েও ভয়ঙ্কর

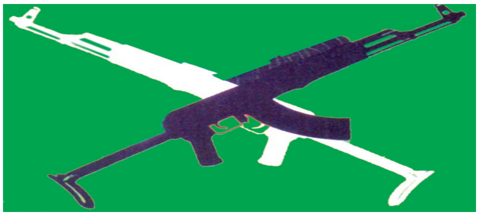

দেবাশিস আইয়ার

আরবান নকশালদের গ্রেপ্তারির পর থেকে চারিদিকে একটা গেল গেল ভাব কিছু প্রকার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কী আবদার, এদিকে তেনারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন, রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করার চক্রান্ত করবেন, অথচ সেই অপরাধে রাষ্ট্র তাদের গ্রেপ্তার করলে তখন তাঁরা চেঁচাবেন ফ্যাসিবাদ বলে।

আচ্ছা, যখন এনারা জঙ্গলে নিজেদের ক্যাঙ্গারু কোর্ট বসিয়ে কোতল করার আদেশ জারি করেন তখন কি সেটা গণতন্ত্র, নাকি ফ্যাসিবাদ? আর ভারাভারা রাও। ইনি কোথায় কী ভাড়া দেন কেউ জানেন না, কিন্তু মাঝে মাঝেই জনগণের সশস্ত্র যুদ্ধ ইত্যাদি নিয়ে নানা জ্ঞানগর্ভ বাণী আমাদের শোনান। তা মশাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তখন রাষ্ট্র তো আপনাদের দুধ-ভাত খাওয়াবে না, লাঠিই মারবে। কাজেই এখন নাকি কান্না কেঁদে লাভ নেই।

নকশালরা আগে ভেবেচিন্তে ঠিক করুক যে তারা ঠিক কী হতে চায়।

গ্রেপ্তার হওয়ার আগে অবধি তারা বিপ্লবী নকশাল থাকলেও গ্রেপ্তার হলেই ফটাফট কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক হতে চায় কেন? আর কবি সাহিত্যিক হলেই কি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী তৈরি করার আর নিরস্ত্র নাগরিক ও ভারতীয় সুরক্ষাবাহিনীকে হত্যা করার ছুট পাওয়া যায় নাকি!

তবে এই আরবান নকশালদের নিয়ে কিচিরমিচিরে আরেকটা খবর ঢাকা পড়ে গেছে। তা হলো ঝাড়খণ্ডের পাকুরে পাকিস্তানপন্থী স্লোগান তুলতে গিয়ে দুই শান্তির ভাই জাহান্নামে চলে গেছে পুলিশের গুলি খেয়ে।

পাকুর আর নকশালের এক সময়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মনে আছে নিশ্চয়, দিন কয়েক আগে এই পাকুরেই স্বামী অগ্নিবেশ নামক এক আরবান নকশাল, থুড়ি বুদ্ধিজীবী, বেশ খানিকটা উত্তম মধ্যম খেয়েছিলেন।

পাকুর ঝাড়খণ্ডের একটা বনবাসী প্রধান অঞ্চল মালদার লাগোয়া। যদি ট্রেনে শিয়ালদা থেকে মালদা যান তাহলে পাকুর হয়েই ট্রেন যাবে। তা এখানে এক সময় মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ ছিল বনবাসী। মূলত মালভূমি অঞ্চল। পাথর খাদান এলাকার মূল রোজগার। পাকুরের পাথর খাদান থেকে পাওয়া পাথর ভেঙে তৈরি হওয়া স্টোন চিপস অত্যন্ত উন্নত মানের। পাকুর থেকে মালদা হয়ে বাংলাদেশে নিয়মিত চালান যায় এই স্টোনচিপস। পাকুর থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব বোধহয় মেরেকেটে ৬০ কিলোমিটার।

এই অঞ্চলে বনবাসীদের মূল রোজগারই ছিল এই পাথর খাদানগুলি থেকে। দীর্ঘদিনের অনুন্নয়নের সুযোগ নিয়ে এখানে এক সময় নকশাল সংগঠন বেড়ে ওঠে। পাকুরে এক সময় পুলিশ ও নকশালদের সংঘর্ষ নিয়মিত খবর ছিল। নকশালদের বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি ঘটনা ঘটতে থাকে তা হলো এখানে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ঘাঁটি গাড়তে থাকে। মোটামুটি ভাবে ৮০-র দশক থেকে মালদা, মুর্শিদাবাদে সিপিএমের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ঘাঁটি গাড়তে শুরু করে। কালিয়াচকের হো চি মিন কলোনি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। এই হো চি মিন কলোনি থেকেই এন আই এ আইসিস জঙ্গি থেকে শুরু করে জাল নোটের কিংপিন ইত্যাদি নানাবিধ বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে থাকে মাঝেমধ্যেই। তবে তা আলাদা গল্প। এই লেখায় সেই প্রসঙ্গে বিশেষ গেলাম না।

৮০-র দশক থেকে মোটামুটি ভাবে ৯০-এর দশকের শেষ অবধি মালদা ও মুর্শিদাবাদে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকতে থাকে। দখল হতে থাকে অত্যন্ত উর্বর নদীর চর, নদীর অববাহিকা অঞ্চল। গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ার জন্য মালদার জমি অত্যন্ত উর্বর। আর ভারতে তথা পশ্চিম বাংলায় ঘাঁটি গাড়ার জন্য বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মূল লক্ষ্যই থাকে জমি। ৯০-এর শেষ ভাগ অবধি এই প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকার পরে আস্তে আস্তে জমিতে টান পড়তে থাকে। তখনই এই অবৈধ

সুধা ভরদ্বাজ

চুয়ান্ন বছর বয়সি সুধা ভরদ্বাজ তিন দশক ধরে ছত্তিশগড়ে বসবাস করছেন। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। ছত্তিশগড়ের পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজের সাধারণ সম্পাদক। মানবাধিকার এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে কাজ করেন। জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক। ১১ বছর বয়েসে ভারতে চলে আসেন এবং ১৮ বছর বয়েসে আমেরিকার নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। কানপুর আই আই টির স্নাতক। ১৯৮৪ সালে পাশ করার পর তার রাজনীতিতে প্রবেশ এবং মাওবাদী তাত্ত্বিকদের সংস্পর্শে আসা।

অনুপ্রবেশকারীদের নজর পড়ে পাকুরে। কিন্তু পাকুরে ঢুকে জমি দখল করা অতো সোজা ছিল না। সেখানকার বনবাসীরা অতো সহজে নিজেদের অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। সর্বোপরি সেখানে সিপিএমও নেই। তাই সহজে ভোটার কার্ড কিংবা রেশন কার্ড পাওয়া যায় না।

এই খানেই দরকার পরে আরবান নকশালদের। তারা বনবাসীদের বোঝাতে শুরু করে যে এরা কয়েকজন এলেও সেটা কোনও সমস্যা নয়। এখন মূল নজর রাখা উচিত বিপ্লবের দিকে। পাকুর এলাকায় তখন নকশালরাই প্রশাসন। তারাই বাংলাদেশি ভাইদের এনে বসাল, এমনকী বিয়েও দেওয়াল। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগতেই পারে, নকশালরা হঠাৎ বিয়ের ঘটকালিতে এতো উৎসাহী হলো কেন? উত্তর লুকিয়ে আছে জমিতে। পাকুর বনবাসী-প্রধান জায়গা হওয়ার কারণে সেখানকার অধিকাংশ জমিই এসটি ল্যান্ড অ্যাক্টের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি যদি উপজাতি না হন তাহলে ওই জমি কিনতে পারবেন না। এদিকে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মূল চাহিদাই হলো জমি। আরও বিশেষ করে বললে পাথর খাদান।

এই সমস্যার সমাধানেই নকশালরা বিয়ের ঘটকালিতে উৎসাহী হলেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে একটি উপজাতি বিধবা মেয়েকে খুঁজে বার করা হয়, যার হয়তো তিনকুলে কেউ নেই। কিংবা কোনও অনাথ মেয়েকে। এবার তার সঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীটির বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই কেল্লাফতে। তাহলেই তখন সেই ব্যক্তি স্ত্রীর নামে জমি কিনতে পারছেন। আর ঘরে একটা কাজের লোকও হলো। বাকি আরও দুই বিবি তো আছেই স্ত্রীর ভূমিকা পালনে। অপরদিকে নকশালদের কোষাগারও ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে।

এই প্রক্রিয়াতে বেশ খানিকটা জমি পাকুরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা দখল করেছে। পাথর খাদানগুলি প্রায় সবই এখন তাদের অধিকারে। সেখানে কাজের জন্যও প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ থেকে আরও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হাজির হচ্ছে। ফলে বনবাসীরা আজ নিজেদের জমি, জীবিকা হারিয়ে অসহায়। ইতিপূর্বেই পাকুরে একবার বেশ বড়োসড়ো দাঙ্গা হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গের কোনও কাগজ সেই খবর ছেপে আমার আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করতে চায়নি। কাজেই সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজকে পাকুরে পাকিস্তানপন্থী স্লোগান উঠবে এটাই স্বাভাবিক। আশার কথা যে,

এরা প্রত্যেকেই সিপিআই (মাওবাদী) দলের সদস্য : মহারাষ্ট্র পুলিশ

মহারাষ্ট্র পুলিশের পেশ করা রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউপিএ সরকার যে ১২৮টি সংগঠনকে মাওবাদী জঙ্গি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে চিহ্নিত করে তদন্ত শুরু করেছিল সেগুলিই সাম্প্রতিক আরবান নকশাল পরিকল্পনার মাথা। আগস্টের শেষ সপ্তাহে যেসব মাওবাদী বুদ্ধিজীবী এবং মানবাধিকার কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁরা এখনও এইসব সংগঠনের সদস্য। ইউপিএ আমলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যে তালিকা তৈরি করেছিল তা থেকে বোঝা যায়, সেসময় দেশের সর্বত্র দিল্লি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাট, কেরল, পঞ্জাব এবং কর্ণাটক ছিল মাওবাদী থিংকট্যাঙ্কের মৃগয়াক্ষেত্র। মহারাষ্ট্র পুলিশের বক্তব্য, সম্প্রতি যেসব বুদ্ধিজীবী এবং মানবাধিকার কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী) দলের সদস্য। সুতরাং এই সংগঠন যেসব জঙ্গি হামলা চালিয়েছে তার দায় এঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। ২০০৭ সালে মহারাষ্ট্র পুলিশ অরুণ ফেরেরা এবং ভারনন গঞ্জালভেসকে গ্রেপ্তার করে। বহু বছর জেলে কাটাবার পর ২০১৩ সালে তারা মুক্তি পান। ভারভারা রাওয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অন্ধ্র এবং তেলেঙ্গনার পুলিশ তাঁকে একাধিকবার গ্রেপ্তার করেছে। জেলও খেটেছেন অনেকবার। উল্লেখ্য, ২০০১-এর পর থেকে এখনও পর্যন্ত সিপিআই (মাওবাদী) দলের জঙ্গি হামলায় ৬,৯৫৬ জন অসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। ২৫১৭ জন নিরাপত্তা কর্মী মারা গেছেন।

ভেরনন গঞ্জালভেস এবং অরুণ ফেরেইরা

মহারাষ্ট্র পুলিশ ভেরনন গঞ্জালভেসকে তাঁর আন্ধেরির (মুম্বই) বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে। অরুণ ফেরেইরাও গ্রেপ্তার হন তাঁর থানের বাসভবন থেকে। ইউপিএ আমলেও ২০০৭ সালে দুজনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। সেবার ভেরনন গঞ্জালভেস মাওবাদীদের সঙ্গে অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অস্ত্র আইন এবং আনলফুল অ্যাকটিভিটিজ (প্রিভেনশন) আইনে গ্রেপ্তার হন। আদালত তাকে পাঁচ বছর কারাবাসের শাস্তি দেয়। একই অভিযোগে এবং একই আইনি ধারায় গ্রেপ্তার হন অরুণ ফেরেইরাও। শাস্তির মেয়াদও ছিল পাঁচ বছরের। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আইন পাশ করেন। তারপর ফৌজদারি উকিল হিসেবে নতুন জীবন শুরু করেন। অন্যদিকে ভেরনন গঞ্জালভেস এখন মুম্বইয়ের একটি খ্যাতনামা কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি মাওবাদী সেন্ট্রাল স্কোয়াডের সদস্য।

ঝাড়খণ্ডের বর্তমান সরকার হিন্দি-পাকি ভাই ভাই তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। তাই তারা গুলিগোলা দাঙ্গাকারীর মাথা লক্ষ্য করেই চালাতে পারছে।

পাপ্পুর সঙ্গীসাথিরা বলছে এই আরবান নকশাল-এর ধারণা নাকি বিজেপির তৈরি। একটু পুরোনো স্মৃতি ঘেঁটে দেখা যাক আরবান নকশালদের নিয়ে পুরোনো সরকারের মতামত। ২০০৬-এ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল নকশালদের ব্যাপারে স্টেপ নেওয়ার কথা বলেছিলেন। ২০১৩-তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সুপ্রিম কোর্ট-এ এভিডেভিট দিয়ে জানিয়েছিল কীভাবে শহুরে ভদ্রবাবুদের তৈরি বিভিন্ন এনজিও-র আড়ালে নকশালরা তাদের শাখা বিস্তার করছে। এদেরকে আটকানোর জন্য প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে স্টেপ নেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। টাইমস-এর এই রিপোর্টটা একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

https://m.timesofindia.com/india/urban-naxals-more- danger-ous-than-the-guerrilla-army-upa-said-in-2013/amp articleshow/65630393.cms

এমনকী আমাদের রাজ্যেও বিগত জমানায় জ্যোতি বা বুদ্ধবাবুর সময়েও সিপিএম আর নকশালদের মারামারি হতো। তাহলে এবারই এদের গ্রেপ্তারে এতো গেল গেল রব কেন? এখানেই আসল রহস্য। আগের জমানায় এই সব ঝগড়া গ্রেপ্তারি ছিল লোক দেখানো। 'তু তু ম্যায় ম্যায়' এর সাস-বহু টাইপ ঝগড়া। তাই ধরা পড়লেও কারো উল্লেখযোগ্য কোনো সাজা হতো না। কিন্তু এবার যে সরকার অন্য। সেটা মাওবাদী আর তাদের শহুরে শুভানুধ্যায়ীরা বুঝে গেছে। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার ভুয়ো এনজিও-কে বন্ধ করার পর থেকেই ওদের ফান্ডিং আসার ব্যবস্থায় ভালোই ঘা পড়েছে। তার মধ্যে এই গ্রেপ্তারিতে ওরা বুঝে গেছে এই সরকার তু তু ম্যায় ম্যায় খেলা খেলবে না। আর যারা ভারাভারার গ্রেপ্তারের পর মানবাধিকারের গল্প করছে তাদের জানা উচিত তারা যে যে দেশ থেকে ওই স্লোগান ধার করছেন তারা কিন্তু রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য কোনো দয়া কখনই দেখায়নি। একটু ইতিহাস চর্চা হয়ে থাক।

ওসিপ্ মানডেলস্টা—কবি। ১৯৩৮ সালের মে' মাসে গ্রেপ্তার, সেই বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর কারেকশন ক্যাম্পে মৃত্যু।

আইজ্যাক বাবল— লেখক, ১৯৩৯ সালের মে' মাসে গ্রেপ্তার, ১৯৪০-এর জানুয়ারি মাসে জেলের ভিতরে গুলিতে মৃত্যু।

বরিস পিলিনেক— লেখক, ১৯৩৭-এর ১০ অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার, ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে মৃত্যুদণ্ড।

জেভলড মেয়েরল্দ—থিয়েটার পরিচালক, ১৯৩৯-এ গ্রেপ্তার এবং ওই বছরের ফেব্রুয়ারিতে জেলের ভেতর গুলিতে মৃত্যু।

টিটজিয়ান টাবিজে— কবি, গ্রেপ্তার ১৯৩৭ এর ১০ অক্টোবর এবং ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

জ্যান স্টেন— দার্শনিক, ১৯৩৭-এ গ্রেপ্তার এবং ওই বছরের জুন মাসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

নিকোলাই দুর্নাভো— ভাষাবিদ, ১৯৩৭-এর অক্টোবরে গ্রেপ্তার এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

নিকোলাই ওলেনিকভ— কবি, ১৯৩৭-এ গ্রেপ্তার এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

নিকোলাই নেভস্কি— ভাষাবিদ, গ্রেপ্তার এবং ১৯৩৭-এর নভেম্বরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

মিকোলা কুলিশ— নাট্যকার, গ্রেপ্তার এবং ১৯৩৬-এর নভেম্বরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

বরিস পাস্তারনেক— কবি, ("Don't touch this cloud dweller"), জেলে মৃত্যু।

সুপ্রিম কোর্ট বললেন, Dissent is the safety valve of democracy. If you don't allow these safety valves, it will burst...

অর্থাৎ ভিন্নমত পোষণ করা গণতন্ত্রের সেফটি ভালভ, যদি ভিন্নমত পোষণ করতে না দেওয়া হয় তাহলে সেই ভালভ ফেটে যাবে।

ভারাভারাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং ১২ সেপ্টেম্বর তথা পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত তারা গৃহবন্দী, থাকবেন। উচ্চ বিচারালয় মহারাষ্ট্র সরকারের প্রবল বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করেছেন। এখানে কিন্তু সরকার কোনো প্রভাব খাটায়নি।

ইতিমধ্যে জেএনইউ ফেমাস শেহেলা রশিদ ৪৭০০ বুদ্ধিজীবীর সই জোগাড় করেছেন ভারাভারাদের পক্ষে। আর নরেন্দ্র মোদী এমনই ফ্যাসিবাদী, আদালত তো দূরের কথা সামান্য ৪৭০০ লোকের স্বাক্ষরেই ঘাবড়ে গেছেন। লাখ লাখ লোক যখন মনে মনে চাইছে যে উনি আরবান নকশালদের সমূলে বিনাশ করুন, তখনো নরেন্দ্র মোদী বলছেন আইন আইনের পথেই চলুক। সরকার সেখানে নাক গলাবে না। ■

সংস্কার ভারতীর শাখায় শাখায় জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর বিভিন্ন শাখা 'কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা'র মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করে। কোনও কোনও শাখায় সংগঠনের ভাব সংগীত ও অঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হাওড়া জেলার বীরশিবপুর শাখা স্থানীয় হরিমন্দিরে পাঁচহাজার মানুষের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বেহালা, আমতা, মেদিনীপুর, ব্যান্ডেল, তমলুক, নবদ্বীপ, গোবরডাঙ্গা, উত্তর কলকাতা, ঢাকুরিয়া, দেশবন্ধুনগর, বাগুইহাটি,

সোনারপুর, বাঁশদ্রোণী, পলাশি প্রভৃতি শাখা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করে।

শিক্ষক দিবসে ভারতীয় জনতা পার্টির শিক্ষক সম্মান প্রদান

গত ৫ সেপ্টেম্বর ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে ভারতীয় জনতা পার্টির শিক্ষক সেলের পক্ষ থেকে তিনজন বিশিষ্ট শিক্ষক— কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিকাশ পাত্র, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ মুখার্জি এবং বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি তথা বাঁকুড়া জেলার আঁধারখোল উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অবনীভূষণ মণ্ডলকে ২০১৮ সালের শিক্ষক সম্মান 'বিদ্যাভূষণ সম্মান'-এ ভূষিত করা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাদেশিক কার্যালয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের বিদ্যাভূষণ সম্মান ফলক, একটি পুস্তক ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করেন দলের রাজ্য সহ-সভাপতি তথা শিক্ষক সেলের ভারপ্রাপ্ত অধিকারী ডাঃ সুভাষ সরকার। অনুষ্ঠানে বহু শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষা, দেশভক্তি, জীবন মূল্যবোধ সম্পন্ন নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন।

রাজ্যজুড়ে মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

রাজ্যের জেলায় জেলায়, সে উত্তরের পাহাড় থেকে দক্ষিণের সাগর— সমস্ত জেলাকেন্দ্রে এমনকী মহকুমাকেন্দ্রেও মহাসমারোহে পালিত হলো শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী। শুধুমাত্র বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগেই সারা রাজ্যে দু'হাজারের বেশি স্থানে শোভাযাত্রাসহ পালিত হয়েছে উৎসব। এছাড়া সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতী সারা রাজ্যে তাদের সমস্ত শাখায় এবং দক্ষিণবঙ্গের বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদ ও উত্তরবঙ্গের বিদ্যা ভারতীর সমস্ত স্কুল নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসব পালন করে। শ্রীরামনবমীর মতোই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মেতে ওঠে এদিন হিন্দু সমাজ।

বীরভূম জেলার সদর শহর মুখর হয়ে ওঠে কৃষ্ণনামে। বিশাল বিশাল সুদৃশ্য ট্যাবলো, সঙ্গে সংকীর্তনের দল, তার সঙ্গে শিশু ও বালক কৃষ্ণদের পথ পরিক্রমা। রামপুরহাট শহরও কৃষ্ণনাম মেতে ওঠে। সেখানে বনবাসী সমাজের ভাই-বোনেরা দাশাই নৃত্য, ধামসা মাদল নৃত্যে শোভাযাত্রায় পা মিলিয়েছে।

পুরুলিয়ার গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাতীয় সম্মানে ভূষিত

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন তথা শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু নতুন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে ৪৫ জন শিক্ষককে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন। শিক্ষক দিবসে সারা দেশের কৃতী শিক্ষকদের মধ্যে পুরুলিয়া জেলার গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিতাভ মিশ্রও জাতীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের পরিবেশ উন্নত করা, প্রকৃতির মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি শিক্ষা সহায়ক বহুবিধ সংস্কার সাধন করেছেন। তিনি বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করেছেন। বিদ্যালয় ছুটির পর তিনি রোজ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণের কর্মসূচিতেও তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। তিনি কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাতে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

নদীয়া জেলার ভীমপুরের শোভাযাত্রা।

হাওড়ায় মহান মাতৃভূমির উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পুণ্য প্রাতে মহান মাতৃভূমির উদ্যোগে হাওড়ার চৌধুরীপাড়া সহ ধাড়সা অঞ্চলে সাড়ম্বরে পালিত হয় 'ভারত জীবন প্রবাহে শ্রীকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী' অনুষ্ঠান। সমবেত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক তথা ভারত ঐতিহ্য সংস্কৃতি গবেষক অসিত কুমার সিংহ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় পুরোহিত সখা মধুসূদন ভট্টাচার্য, ড. রণিতা রায়চৌধুরী, শিল্পী প্রশিক্ষক রজত সিনহা, ড. হিমা দীর্ঘাঙ্গী, ড. কৌশল্যা পাণিগ্রাহী, ড. বিশাখা প্রিয়ম্বদা, ড. রূপালি অগ্নিহোত্রী, ভারত জ্যোতিষ আদিত্যন শাস্ত্রী, অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ, আবৃত্তি শিল্পী সুরজিৎ দাস, ড. সুমন্দ্রা বিদ্যাভারতী প্রমুখ।

বেদের বিশ্বস্রষ্টা আজ শুধুই যন্ত্রের দেবতা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বিশ্বকর্মা। নামের মধ্যেই তাঁর দেবত্ব, কর্ম এবং মহিমার উদ্ভাস। সাধারণভাবে শিল্প, প্রযুক্তি, নির্মাণ কর্মের রূপকার তিনি। তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে ত্রিলোক সমুজ্জ্বল। এই মহাবিশ্বের সব কিছুর তিনিই স্রষ্টা এমন কথাও বলা হয়ে থাকে। বেদ থেকে শুরু করে পুরাণ ইত্যাদিতে বিশ্বকর্মার নানা কর্মের যে ইতিহাস বিধৃত তাতে তাঁকে মহাস্রষ্টা বলে স্বীকার করতেই হয়।

বেদে তিনি বিশ্বস্রষ্টা। জগৎপতি। উপনিষদে তিনিই আবার পরব্রহ্ম। সবকিছুর মূল। পুরাণে তাঁর প্রকাশ দেবশিল্পী রূপে। এখানেও স্রষ্টা তিনি; কিন্তু ক্ষেত্র হলো কিছুটা সীমাবদ্ধ। আর তারই পথ ধরে বিশ্বকর্মা মহাসন্ত্রী। শুধুই যন্ত্রের দেবতা।

বেদে তিনি সর্বশক্তির উৎস। তিনি জগৎসৃষ্টিকারী এই জগতের প্রতিপালক, আবার জগৎ বিনাশকও। তাঁর এই ত্রিরূপ থেকেই তিনি স্রষ্টা হিসেবে ব্রহ্মা, পালনকর্তা হিসেবে বিষ্ণু এবং ধ্বংসকারী হিসেবে মহাকাল-মহাদেবকে সৃষ্টি করেন। এমন কথাই বলে থাকেন অনেকে। বিশ্বকর্মার রূপ কল্পনাতেও দেখা যায় বৈচিত্র্য।

বঙ্গদেশে হাতির ওপর অধিষ্ঠিত তাঁর মূর্তি। সে মূর্তি যেন ময়ূর ছাড়া কার্তিক। সুপুরুষ-রাজোচিত গঠন। চার হাতে হাতুড়ি, কুঠার, তির-ধনুক এবং তুলাদণ্ড। অন্যদিকে, উত্তরভারত বা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বিশ্বকর্মা মূর্তিরও চারটি হাত। কিন্তু সেই চার হাতে থাকে উপবীত, কমণ্ডলু, বেদ ও লেখনি। আর মুখভরা সাদা গোঁফদাড়ি এবং মাথায় রাজমুকুট। এইসব অঞ্চলে বিশ্বকর্মা উচ্চাসনে অবস্থিত। পাশে রয়েছে হাঁস।

বেদের যুগে বিশ্বকর্মা ছিলেন মুখ্যদেবতা। সমস্ত শক্তির আধার। সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। অথচ পরবর্তীকালে তিনিই পরিণত হন প্রায় অকিঞ্চিৎকর দেবতায়। তাঁর এই বিবর্তন কিছুটা বিস্ময়কর। বঙ্গদেশে বিশ্বকর্মা কোনো এক সম্প্রদায়ের দেবতা নন। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে কলকারখানা, শিল্পসংস্থা বা যেখানেই যন্ত্রের ব্যবহার সেখানেই পূজা হয় তাঁর। কিন্তু উত্তর বা পশ্চিম ভারতে তিনি লোহার সম্প্রদায়ের একবারে নিজস্ব দেবতা রূপেই পূজিত হন। বিশ্বকর্মা তাঁদের যুগদেবতা বলে লোহারারা তাঁদের পদবি হিসেবে বেছে নিয়েছেন এই বিশ্বকর্মা শব্দটিকেই।

বঙ্গদেশে বিশ্বকর্মার পূজা বছরে শুধু একদিন--- ভাদ্র- সংক্রান্তিতে। এখানে বিশ্বকর্মার কোনো মন্দিরের কথাও জানা যায় না। কিন্তু উত্তর, পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতের বহু জায়গাতেই রয়েছে বিশ্বকর্মার বিশাল বিশাল মন্দির। সেইসব মন্দিরে বিশ্বকর্মার মূর্তি ব্রহ্মার মতো একথা আগেই বলা হয়েছে। ইলোরায় সপ্তম শতকের একটি গুহা রয়েছে।

বৌদ্ধ আমলের ওই দশ সংখ্যক গুহাটি সাধারণভাবে বিশ্বকর্মা গুহা নামেই পরিচিত। এখানে পূজিত হন বুদ্ধদেব। কিন্তু গুহাটি সম্ভবত তাঁর চিত্রশিল্প সম্ভারের জন্য বিশ্বকর্মা গুহা নামে চিহ্নিত। এর থেকে বোঝা যায়, সপ্তম শতকেও বিশ্বকর্মা স্বমহিমাতেই বিরাজিত ছিলেন। স্থানীয়দের কাছে অবশ্য ইলোরার এই গুহাটি 'সুতার কী ঝুপ্রি' নামে পরিচিত।

বেদে বলা হয়েছে, বিশ্বকর্মা হলেন স্বয়ম্ভু। যখন কোনো কিছু ছিল না, চারিদিকে ছিল শুধু অন্ধকার আর জল। সেসময় বিশ্বকর্মাই জগৎ সৃষ্টি করে তার মাথার চাঁদোয়ার আকারে আকাশকে ব্যাপ্ত করেন। সে সময় তিনি নিজেই নিজের থেকে সৃষ্টি করেন দেবতা ও জীব জগৎ। তাঁর রূপ বর্ণনায় ঋগ্বেদের (১০।৮২।২) মন্ত্র— 'বিশ্বকর্মা বিমলা অদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পবসোত সন্দৃক'— যিনি বিশ্বকর্মা, বৃহৎ তাঁর মন, তিনি নিজেও বৃহৎ। তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সব কিছুই দেখেন। পণ্ডিতরা মনে করেন, সপ্তঋষি লোকের পরবর্তী যে স্থান, সেখানেই তাঁর অবস্থান।

প্রথম স্তরে বিশ্বকর্মাই আদিস্রষ্টা। তিনি অজর, অমর। তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই। নেই আবির্ভাবের কোনো কথা। কিন্তু যখনই তিনি হলেন পুরাণের দেবতা, তখনই এলো তাঁর জন্মের কথা। পুরাণ মতেই জন্ম হলো তাঁর বৃহস্পতির বোন মহানাগিনী পরিব্রাজিকা বরস্ত্রীর গর্ভে। বাবা তাঁর প্রভাস নামে এক বসু। বিশ্বকর্মার এই জন্মকাহিনি আছে বিষ্ণুপুরাণে। সেখানে বলা হয়েছে বরস্ত্রী প্রভাসের পুত্র বিশ্বকর্মা হলেন সহস্র শিল্পের কর্তা। তিনি দেবতাদের সূত্রধর। সমস্ত ভুবনের নির্মাতা, শ্রেষ্ঠশিল্পী। তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয়েছেন প্রজাপতি।

বিষ্ণুপুরাণ এবং গড়ুর পুরাণ মতে বিশ্বকর্মার চার ছেলে। তারা হলেন— অজৈকপাদ, অহির্বধ্ন, ত্বষ্টা ও রুদ্র। কিন্তু স্কন্দপুত্র হলেন মনু, ময়, ত্বষ্টা, শিল্পী এবং দেবল। দুটি তালিকাতেই পাওয়া যায় ত্বষ্টার নাম। ফলে এই দুটি পুরাণে উল্লেখিত নাম অনুযায়ী বিশ্বকর্মার পুত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় আট। এর বাইরেও বিভিন্ন পুরাণ এবং মহাকাব্যে বিশ্বকর্মার পুত্র হিসেবে নাম পাওয়া যায় বানর নলের। এই আটটি ছেলে ছাড়া বিশ্বকর্মার ছিল চারটি মেয়ে। এদের নাম সংজ্ঞা, চিত্রাঙ্গদা, সুরূপা এবং বর্হিস্মতী। এঁদের মধ্যে সংজ্ঞা হলেন সূর্যের স্ত্রী।

পুরাণে ত্বষ্টা হলেন বিশ্বকর্মার ছেলে। কিন্তু বেদে যে ত্বষ্টার উল্লেখ রয়েছে তাঁকেই অনেকে বিশ্বকর্মা বলে অভিহিত করতে চান। বিশ্বকর্মার মতোই ত্বষ্টারও ছিল একই ধরনের গুণ। কিন্তু যে কারণেই হোক, পরবর্তীকালে ত্বষ্টার সবগুণই আরোপিত হয় বিশ্বকর্মায় এবং ত্বষ্টা হয়ে যান তাঁরই পুত্র।

বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থে বিশ্বকর্মার পাঁচটি স্বরূপের কথা বলা হয়েছে।

(১) সৃষ্টিকর্তা রূপে তিনি বিরাট বিশ্বকর্মা।

(২) শিল্পাচার্য রূপে তিনি বিধাতা প্রভাসপুত্র ধর্মবংশী বিশ্বকর্মা।

(৩) বসুপুত্র রূপে তিনি অঙ্গিরাবংশী বিশ্বকর্মা।

(৪) শিল্পগুরু হিসেবে সুধন্বা বিশ্বকর্মা।

(৫) শুক্রাচার্যের নাতি ও শিল্পগুরু হিসেবে ভৃগুবংশী বিশ্বকর্মা।

সাধারণ ভাবে বিশ্বকর্মার একটিই মাথা। কিন্তু স্কন্দপুরাণ মতে বিশ্বকর্মার পাঁচটিমাথা। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ঋষিমন্ত্রে এগুলির উদ্ভব। এদের নাম মনু, ময়, ত্বষ্টা, শিল্পী ও দেবতা। এই পাঁচটি আবার বিশ্বকর্মার ছেলেদেরও নাম।

বিশ্বকর্মা সমস্ত সৃষ্টির জনক। প্রাণীর উদ্ভব ঘটতে তিনিই সৃষ্টি করেন পঞ্চ-প্রজাপতির। এঁরা হলেন,— সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ এবং ঈশান।

বিশ্বকর্মা সত্যযুগে সৃষ্টি করেন স্বর্গ, ত্রেতাযুগে তিনি গড়েছিলেন স্বর্ণলঙ্কা আর দ্বাপরে দ্বারকাপুরী। এরই সঙ্গে তিনি গড়েছিলেন ইন্দ্রপুরী, যমপুরী, বরুণপুরী, কুবেরপুরী, পাণ্ডবপুরী, সুদামাপুরী ইত্যাদি। তিনিই সূত্রধর হিসেবে দেবতাদের জন্য তৈরি করেছিলেন নানা আভরণ ও অস্ত্র। দধীচির অস্থি নিয়ে তিনিই ইন্দ্রর জন্য নির্মাণ করেন বজ্র। ব্রহ্মার কথায় তিনিই নির্মাণ করেন কিস্কিন্ধ্যা।

স্বর্ণলঙ্কার স্রষ্টা বিশ্বকর্মা প্রথমে এটি তৈরি করেছিলেন শিব-পার্বতীর জন্য। পার্বতীকে বিয়ে করার পর শিব তাঁদের জন্য একটি অপূর্ব পুরী তৈরি করতে বলেন বিশ্বকর্মাকে। নির্দেশ অনুযায়ী বিশ্বকর্মা তৈরি করেন এক কনকধাম। গৃহ প্রবেশের জন্য পুরোহিত হিসেবে আহ্বান করা হয় কুবের ও রাবণের পিতামহ পুলস্ত্য ঋষিকে। ওই কাঞ্চনপুরী দেখে তো ঋষি মোহাবিষ্ট। তাই অনুষ্ঠান শেষ শিবেরই আহ্বানে পুলস্ত্য দক্ষিণা হিসেবে চান ওই কনকপুরীই।

নিজের কথা রাখতে শিব সঙ্গে সঙ্গে তা দেন পুলস্ত্যকে। পুলকিত ঋষি সেটি দেন তাঁর বড়ো নাতি কুবেরকে। ভীষ্মকে বিশ্বকর্মার তৈরি গগনবিহারী পুষ্পক রথটিও দেন তাঁরা। কিন্তু এতে ক্রুদ্ধ হন রাবণ। আপন বাহুবলে জ্যেষ্ঠ কুবেরকে পরাজিত করে, স্বর্ণলঙ্কা এবং পুষ্পক রথ দুয়েরই অধিকারী হন।

ত্রিলোক সুন্দরী তিলোত্তমা— তারও স্রষ্টা বিশ্বকর্মা। ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় শিবকে একটি রথ তৈরি করে দেন বিশ্বকর্মাই। বড়ো মেয়ে সংজ্ঞা তার স্বামী সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যায়। তখনও মুশকিল আসান করেন বিশ্বকর্মাই। ভ্রমি যন্ত্রে বসিয়ে কমিয়ে দেন সূর্যের তেজ।

বড়ো মেয়ের জন্য এসব করলেও আরেক মেয়ে চিত্রাঙ্গদা রাজা সুরথকে বিয়ে করতে চাইলে ক্ষিপ্ত হন বিশ্বকর্মা। রেগে মেয়েকে অভিশাপ দেন, কোনোদিন বিয়ে হবে না তার। বিশ্বকর্মার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ যক্ষ গুহ্যক পাল্টা অভিশাপ দেন বিশ্বকর্মা অচিরেই বাঁদর হয়ে বিচরণ করবেন বলে।

অনেক কান্নাকাটির পর মেলে শাপমুক্তির উপায়। তাঁর ও ঘৃতাচীর একটি বানরপুত্র জন্মালে বিশ্বকর্মা পূর্বরূপ পাবেন। তাঁদের সেই পুত্রই হলো নল। রামায়ণে সেতু বন্ধনের প্রযুক্তিবিদ।

বিশ্বকর্মাই তৈরি করেন পুরীর জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তি। রচনা করেন স্থাপত্যবেদ নামে একটি উপবেদ।

বেদে সৃষ্টিশক্তির রূপকনাম বিশ্বকর্মা। ধাতা, বিশ্বদ্রষ্টা, প্রজাপতি, সর্বজ্ঞ, পিতা, বাচস্পতি, মনোজব, বদান্য, কল্যাণকর্মা তাঁরই নাম। যজুর্বেদে তিনি প্রজাপতি, অথর্ববেদে পশুপতি। আর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তিনিই রুদ্র শিব।

দেবতাদের নামকরণ করেন বিশ্বকর্মা, আর সর্বমেধ নামে এক যজ্ঞ করে বলি দেন নিজেকে নিজেরই কাছে। এসব কারণেই মর্ত্যজীবের কাছে অনধিগম্য তিনি।

বিশ্বকর্মার বিশ্বব্যাপী রূপ আজ সীমাবদ্ধ এক যন্ত্রের দেবতায়। বছরে একবারই শুধু তাঁর পূজা হয় এই বঙ্গদেশে। ■

নারকেল সংস্কৃতি ও ভারতীয় ঐতিহ্য

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

নারকেলকে বলা হয় ‘কল্পবৃক্ষ’ অর্থাৎ স্বর্গের উদ্ভিদ। এর উপযোগিতা কেবল খাদ্য, পানীয় এবং আশ্রয়কেন্দ্রিক নয়। একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল জোগানদায়ী উদ্ভিদ হলো নারকেল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর মাহাত্ম্য এই সত্যের উপর প্রত্যয়িত যে নারকেল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হয় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে।

২ সেপ্টেম্বর বিশ্ব নারকেল দিবস। প্রতি বছরই বিশ্ব নারকেল দিবসের একটি বার্তা থাকে। গত বছরের তাৎপর্য যে মূল রাগিণীতে বাঁধা হয়েছিল তা হলো : পারিবারিক সমৃদ্ধির পরিপুষ্টির জন্য জীবনবৃক্ষ নারকেল; Coconut, the tree of life sustains family well being. এই দিনটি আসলে নারকেল ফসল থেকে সম্বৎসর মানবসভ্যতা কীভাবে উপকৃত হয়, তারই ধন্যবাদাত্মক দিবস, Thanks giving day of coconut. কেবলমাত্র ভারতবাসীই যে দিনটি পালন করে তা নয়, এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নানান দেশ ও জাতি এদিন এই বৃক্ষপূজায় ব্রতী হয়েছে। হ্যাঁ, আমি একে পুজোই বলবো; tree worship, বৃক্ষপুজো, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য।

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলছেন, ‘একো বৃক্ষো দশঃ পুত্র সমাচারেৎ।’ অর্থাৎ এক বৃক্ষ দশ পুত্রের সমতুল্য। আমরা আন্দাজ করতে পারি মানুষ বৃক্ষ থেকে, বিশেষ করে কল্পবৃক্ষ থেকে কত উপকার গ্রহণ করলে এমন কৃতজ্ঞতায় কাব্য রচনা করতে পারেন। উপনিষদে আছে ‘পশ্য দেবস্য কাব্যম্’, অর্থাৎ তোমরা দেবতার রচিত কাব্য দেখো। কোন সেই কাব্য? ধরা যাক আরব সাগরের বুকে লাক্ষাদ্বীপ কিংবা বঙ্গোপসাগরের বুকে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গহন নারকেল বৃক্ষরাজি। হ্যাঁ, সেই বাগিচা, সেই নীল আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া নারকেলের পল্লবরাজি তো দেবতার রচিত কাব্যই বটে। সবাই জানেন, গোয়া, দমন, দিউ এবং মহারাষ্ট্রের মানুষ নারকেল ফলকে ‘শিব’ বলে মনে করেন। কারণ খোসা ছাড়ানো নারকেল মালাইয়ে তিনটি চোখ দেখা যায়, যা শিবের ত্রিনয়নকে মনে করিয়ে দেয়। ওই অঞ্চলের মানুষ আগস্ট-সেপ্টেম্বর বা ভাদ্র পূর্ণিমা তিথিতে ‘নারকেল পূর্ণিমা’ পালন করে। সারা বছর সমুদ্রের দেবতা বরুণ এই অঞ্চলের মানুষদের মাছ দিয়ে বাঁচান। প্রতিদানে নারকেল পূর্ণিমায় এখানকার মানুষ নারকেল ভেঙে আরবসাগরের তীরে গিয়ে ‘সমুদ্র জাগায়’ আর নারকেল উৎসর্গ করে। এই আচারের উদ্দেশ্য দুটি— প্রথম, সমুদ্র বা বরুণ দেবের সঙ্গে মহাদেবের মিলন; দ্বিতীয়, বরুণ দেবতার সন্তান মাছেদের সুষম আহার প্রদান। হ্যাঁ, এই পুণ্যদিনে সম্পূর্ণ ফল ও শাঁস-- দুই-ই সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। ছোবড়া-সহ গোটা ফল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এক সময় দূর দিগন্তে পৌঁছে স্বাভাবিক নারকেল বন গড়ে উঠবে— এই ছিল উদ্দেশ্য। নারকেল ফাটিয়ে সমুদ্রপুজোতে সামুদ্রিক নানান প্রাণী ও মাছের খাবার হয়ে উঠবে তার মনোরম শাঁস— এ তো প্রকৃতিচর্যার এক অনন্য উৎসব। সেই প্রাচীন প্রথা মনে রেখেই তারই কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব নারকেল দিবস। অনেকটা প্রাচীন ঐতিহ্যকে নবনির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ বলে মনে হয়, New construction of myth or reconstruction of myth.

> **দিনটি পালন তখনই সার্থকতা লাভ করবে যখন নারকেল চাষ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কৃষিজীবী পরিবার তাদের আয় বাড়াতে সক্ষম হবে, নারকেল চাষ ও নানান সামগ্রী রপ্তানির মাধ্যমে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সমর্থ হবে।**

Asia & Pacific Coconut Committee অর্থাৎ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারকেল গোষ্ঠী যার মূলকেন্দ্র ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, তারাই এই নারকেল দিবসের বিশ্ব-আহ্বায়ক। ২ সেপ্টেম্বর ওই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবসও বটে। এটি একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ব সংস্থা, যার সদস্য দেশ ১৮, তারা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারকেল উৎপাদন বলয়ে এই ফসলের উন্নয়ন, সমন্বয়সাধন ও একসূত্রীকরণের ভরসা। এই দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে, নারকেল এক প্রাচুর্যময় উদ্ভিদ, Tree of Abundance. এই দিনটি মনে করিয়ে দেবে, দারিদ্র দূরীকরণে নারকেল এক অনবদ্য প্রাকৃতিক দান। ভারতবর্ষে নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ বা Coconut Development Board এই দিনটিকে নানাভাবে উদ্‌যাপনের পথিকৃৎ। এই দিনটি পালন তখনই সার্থকতা লাভ করবে যখন নারকেল চাষ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কৃষিজীবী পরিবার তাদের আয় বাড়াতে সক্ষম হবে, নারকেল চাষ ও নানান সামগ্রী রপ্তানির মাধ্যমে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সমর্থ হবে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

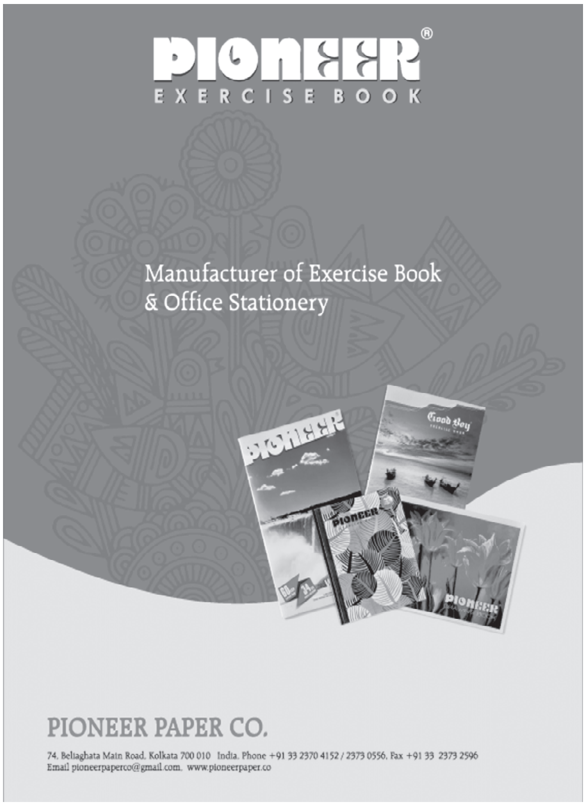

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

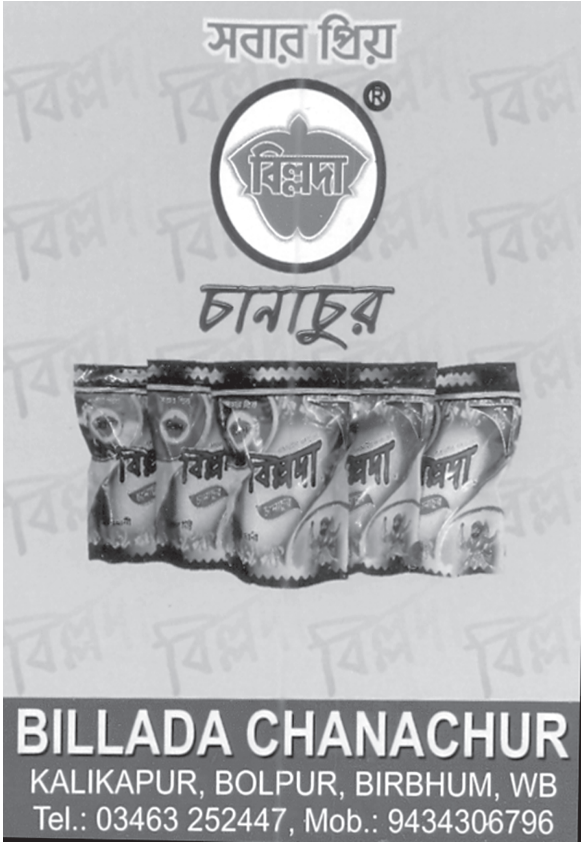

ভূদেব বন্ধু রাজনারায়ণ বসু

বিজয় আঢ্য

মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় (২২.০২.১৮২৭—১৫.০৫.১৮৯৪) তাঁর সমসাময়িকরূপে পেয়েছিলেন তৎকালীন বঙ্গসমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের। রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই দিকপালদের মধ্যে মনীষী ভূদেবের বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু (৭.৯.১৮২৬—১৮.৯.১৮৯১)।

ডিরোজিও-র পরের পর্বে হিন্দু কলেজের তিনজন অন্তরঙ্গ সতীর্থ—খ্রিস্টান মধুসূদন, ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ ও হিন্দু ভূদেব। ভূদেববাবু রাজনারায়ণ বসুকে এত শ্রদ্ধা করতেন যে, তিনি একদিন রাজনারায়ণবাবুকে বললেন, 'রাজনারায়ণ! তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আমার পৈতা তোমার গলায় দি।' এই বলে তিনি আপনার যজ্ঞোপবীত রাজনারায়ণবাবুর গলদেশে ঝুলিয়ে দিলেন। ওই যজ্ঞোপবীত রাজনারায়ণবাবু শেষ জীবন পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। একবার কানপুর থেকে ভূদেববাবু ও রাজনারায়ণবাবু একত্রে কান্যকুব্জ নগর দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ভূদেববাবু রাজনারায়ণবাবুকে বলেছিলেন— 'রাজনারায়ণ। তোমার ও আমার পূর্বপুরুষ এ স্থান হইতে বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন, আমরা উভয়ে সেই পূর্বপুরুষের স্থান দেখিতে আসিয়াছি।' বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বক্তৃতার সংবাদ শুনে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। 'আমি রাজনারায়ণবাবুকে সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম এবং তাঁহার সহিত অভিন্ন হৃদয় হইতে অভিলাষী হইলাম।'

শিক্ষা, সাহিত্য, ব্রাহ্মধর্ম, জাতীয়তা, স্বদেশীয় সমাজের সার্বিক উন্নতিসাধনে রাজনারায়ণ বসু এক চিরব্রতী ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তিনি দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করেছেন। তাঁর রচিত 'একাল ও সেকাল', বঙ্গ-সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা,

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রবন্ধ, 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা, 'আত্মচরিত'—এই রচনাগুলির মধ্যে স্বাদেশিকতার ছাপ স্পষ্ট। ১৮৬৬ সালে তিনি Prospectous of a society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা (প্রবন্ধ) রচনা করেন। 'আত্মচরিত'-এ তিনি লিখেছেন, তাঁর এই প্রবন্ধ পড়েই নবগোপাল মিত্র 'হিন্দু মেলা' ও 'জাতীয় সভা' স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজনারায়ণ তিনটি ক্ষেত্রে হিন্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসাবে হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত লেখার সময় তিনি হিন্দু কথাটির উপর জোর দেন। দ্বিতীয়ত, তাঁকে হিন্দু মেলার উদ্গাতা হিসাবে দেখা যায়। তৃতীয়টি তাঁর হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রবন্ধ।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বক্তৃতা তাঁকে রাতারাতি খ্যাতি এনে দেয় এবং তা এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, কলকতার সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভাও ব্রাহ্ম রাজনারায়ণকে তাঁদের সভায় তা পড়বার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ (কেশব সেনের নেতৃত্বাধীন) এবং খ্রিস্টীয় মিশনারিরা যখন বিভিন্নভাবে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করছিল, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে তিনি এই বক্তৃতা

রাজনারায়ণ বসু

করে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই বক্তৃতার উপসংহারে ইংরাজ কবি মিল্টনের স্বজাতির উন্নতি সম্বন্ধে আশার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন— ''আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি;... এই জাতি নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ও ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে। হিন্দু জাতীয় কীর্তি, হিন্দু জাতীয় গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।''

দেশপ্রীতিই ছিল রাজনারায়ণের ইষ্টপ্রেম, স্বদেশ চিন্তাই ছিল তাঁর ইষ্ট আরাধনা। এই মন্ত্রের প্রধান উদ্গাতা ছিলেন রাজনারায়ণ। তাঁর বক্তব্য--- ''আমি বিশ্বজনীনতা বড় ভালবাসি, কিন্তু যে বিশ্বজনীনতা আমাকে আমার স্বদেশকে ভুলাইয়া দেয়, তাহা আমি অসুস্থতা জ্ঞান করি।'' সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে মহাহিন্দু সমিতির পরিকল্পনা রাজনারায়ণের

জাতীয়তাবোধের চরম প্রকাশ। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (১৮০৩ শকের আশ্বিন সংখ্যা) তিনি লেখেন—''ঈশ্বরের প্রিয় কার্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সাধন সর্বাপেক্ষা প্রধান 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভূদেব ও রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রেম এক অভিন্ন প্রেরণামন্ত্রে উৎসারিত। 'সামাজিক প্রবন্ধ'-এর উপসংহারে ভূদেবও লিখেছেন—'সম্প্রতি তিনি এসব মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' ভূদেবের মতেও ভারতবর্ষে জাতীয়তার একটা নিজস্ব আদর্শ আছে। আর্য হিন্দু সমাজের ভাবই ভারতবর্ষে জাতীয় ভাব। এই জাতীয় ভাবরূপ 'কল্পবৃক্ষের সুমহৎ কাণ্ড হিন্দু সমাজ।' হিন্দু সমাজের জাগরণের জন্য পরবর্তীকালে 'মহাহিন্দুসভা'র মতো সভাসমিতি স্থাপনের যে চেষ্টা চলেছিল তারও আদিমতম বীজমন্ত্রটি উচ্চারিত হয়েছিল 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' ও 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' গ্রন্থে।

হিন্দু সমাজ যখন ভেদবুদ্ধিতে দীর্ণ। তখন নির্ভীকভাবে উদারতার সঙ্গে 'বৃদ্ধ হিন্দু'-তে লিখেছিলেন—'যে কোনো ব্যক্তি আপনাকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিবেন, তিনিই সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।... যাঁহারা মুসলমান ধর্ম অথবা খ্রিস্টীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাও সভ্য হইতে পারিবেন।' বাংলায় উনিশ শতককে নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে Grand father of Indian Nationalism অভিধায় ভূষিত করা তাই অমূলক নয়। পরবর্তী যুগ ও প্রজন্মের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বরণীয় ও নমস্য। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাঁকে দর্শন করতে স্বামী বিবেকানন্দ দু'বার— ১৮৮৯ ও ১৮৯৮ সালে দেওঘরে ছুটে গিয়েছিলেন। বস্তুত আমৃত্যু তিনি বঙ্গীয় সমাজের এক উজ্জ্বল জ্যোতিস্করূপে বিরাজমান ছিলেন।

তাঁর রচিত 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে তাঁর সমাজমনস্কতার পরিচয় পাই। 'সে কালের' তুলনায় 'এ কালের' (উনিশ শতকের) লোকের রুগ্ন ও অল্পায়ু হওয়ার এগারোটি কারণ আলোচনা করেছেন। পরানুকরণ, বিশেষত ইংরাজদের রীতিনীতি অনুকরণ করা সম্পর্কে তীব্র বিদ্রূপ করেছেন। তৎকালীন সমাজে শিক্ষায় ত্রুটি, পান দোষ, স্বার্থপরতা, বিলাসিতা ও আলস্য ইত্যাদির নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরেছেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না। বিরোধ ছিল পুরোহিততন্ত্রের গড্ডলিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তার আদর্শ ছিল সত্যের প্রতি অনুরাগ ও বাস্তববোধ। সমাজ সংস্কারের চেয়ে সমাজ সংরক্ষণকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন Conservative বা রক্ষণশীল, তিনিও তেমন ছিলেন। সেই সময়ে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল সমাজের বহু নারীর ভাগ্যে অকালবৈধব্য। বিদ্যাসাগর যদি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রকৃত রূপকার হন, তবে তিনি তাঁর প্রকৃত সহযোদ্ধা। তিনি তাঁর দুই ভাইকে বালবিধবাদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সমাজ সংস্কার বা অসবর্ণ বিবাহে তাঁর আপত্তি না থাকলেও ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের বিবাহ বিলের 'আমি হিন্দু নই' এই স্বীকারোক্তি তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তিনি জানতেন, হিন্দুর মহত্ত্ব ঐশ্বর্যে নয় বীর্যে নয়— মহত্ত্ব চরিত্রে, ধর্মে। তাঁর বন্ধু ভূদেবও জীবনের সাফল্যকেই ব্যক্তির একমাত্র আদর্শ বলে স্বীকার করেননি। সকামভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ ও নিষ্কামভাবে তাকে অতিক্রমের চেষ্টা--- ভারতীয় জীবনের এই আদর্শ অনুসরণই ছিল তাঁর ইচ্ছা। বস্তুত ভূদেবও তাঁরই মতো ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, প্রগতিতে উৎসাহী একজন আত্মস্থ মানুষ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে রাজনারায়ণের এক অপরূপ স্মৃতিচারণ করেছেন—'ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল... তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে। কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ছোট তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না।... এমন কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতো ছিলেন।... এদিকে তিনি মাটির মানুষ, কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস।... এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।' ■

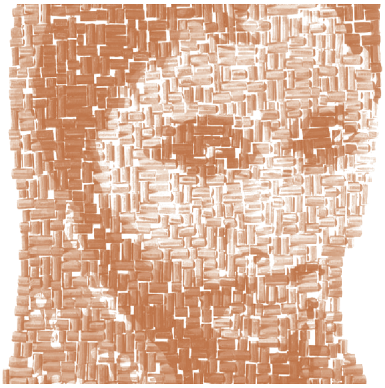

দূরবর্তিনী

রূপশ্রী দত্ত

গোল সাদা কাঁচের জানলা ঘেরা একতলা বাড়িটার দিকে নিদাঘের দুপুরে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলেন অতসীলতা।

কত যুগ, কত কাল আগে অতসীলতা এ বাড়ির ন' ছেলে মনোরঞ্জনের বৌ হয়ে এসেছিলেন। পল্লীগ্রামের মেয়েকে সেদিন দারিদ্র্যের দুঃখ বুঝতে দেননি মনোরঞ্জনের বাবা শোভনলাল। তাঁর অন্য পুত্রবধূরা অবশ্য এসেছিল শহুরে ধনাঢ্য পরিবার থেকে। বিয়ের পর মনোরঞ্জন বাঁশি বাজাতেন। সেই বাঁশির সুর ছড়িয়ে পড়ত দূরে দূরান্তরে। বড় ভাসুর সপরিবারে অন্যত্র বাড়ি করে বসবাস করেন। মেজ ভাসুর বিপত্নীক। সেজ ভাসুরকে বাল্যকালে তার নিঃসন্তান জ্যাঠা যজ্ঞ করে দত্তক নিয়েছিলেন।

বিয়ের একমাসের মধ্যেই দার্জিলিঙে কার্যোপলক্ষ্যে যেতে হলো মনোরঞ্জনকে। যাবার দিন অতসীকে বলে গিয়েছিলেন— 'দার্জিলিঙের গোল্ডস্টোনের মালা আনব তোমার জন্যে। আর পরেরবার দার্জিলিঙে গিয়ে টাইগার হিল থেকে দুজনে একসঙ্গে সূর্যাস্ত দেখব।' সে সুদিন আর অতসীর জীবনে আসেনি।

মনোরঞ্জন ফিরে এসে অতসীকে বলেছিলেন— 'একটা কথা তোমাকে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি। তোমার সঙ্গে আর আমার থাকা সম্ভব নয়।' ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও এতটা স্তম্ভিত হতেন না অতসী। মনোরঞ্জন বলে চললেন— 'কোনও রাগ-ঝগড়া বা অসন্তোষ নয়। তোমার বিরুদ্ধে আমার বিন্দুমাত্র অভিযোগও নেই। আমি তোমাকে চিনি; ভালোভাবে জানি। তাই বিশ্বাস করি, আমার জন্যে এটুকু ত্যাগ স্বীকার তুমি করবে। ওখানে এক জ্যোতিষী আমাকে দেখে বলেছেন, সহধর্মিণীর সাহচর্য না ছাড়লে জীবনে অবনতি ও পতন অবশ্যম্ভাবী।' ঝড়ের মতো বেরিয়ে গিয়েছিলেন মনোরঞ্জন। অতসীর বোধশক্তি তখন কেমন যেন ঝিমিয়ে গিয়েছিল। এ কেমন ভালোবাসা, সামান্য জ্যোতিষীর কথায় যাতে ফাটল ধরে। একি অস্বাভাবিক উচ্চাশা, যার জন্য চূড়ান্ত অমানবিক হয়ে সহধর্মিণীকেও ত্যাগ করতে হয়। তাহলে তাই ভালো। স্বামীর চোখে বিষকন্যা সেজেই অতসীকে সারাজীবন তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে হবে। প্রথমে পৃথক কক্ষ, তারপর বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যেই ছোটো একতলা, নিজের জন্য তৈরি করিয়েছিলেন মনোরঞ্জন। ভৃত্যের মাধ্যমে মনোরঞ্জন খোরপোশ পাঠিয়ে দেন অতসীকে। প্রেমহীন জীবনে স্বামীর দেওয়া এই অর্থ, অতসীকে তীব্র মর্মযন্ত্রণা দেয়। বিবাহবিচ্ছিন্না হলেও হয়তো এই প্রাপ্য অর্থ তার এতখানি মানসিক পীড়ার কারণ হতো না। কিন্তু তিনি তো কোনওদিনই সে মানুষটির সঙ্গে বিচ্ছেদ চাননি। উপরন্তু পড়ে আছেন তারই সংসারে কারো কাকিমা, কারো জেঠিমা হয়ে। এসব সম্পর্কগুলোও সেই মানুষটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অভ্রান্তভাবে জানিয়ে দিচ্ছে। বিপত্নীক বৃদ্ধ বাবা মারা গেছেন বহুদিন। একমাত্র ভাই সেও আর্থিক অস্বচ্ছলতায় ভুগছে। সুতরাং সেখানে ফিরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। মনের সঙ্গোপনে আর একটা ব্যাপারও কি ছিল না? মানুষটাকে দূর থেকে একটু লুকিয়ে দেখার লোভ। জানলার সামনের ইজিচেয়ারে বসে থাকলে অতসী তো তাকে ভালভাবেই দেখতে পান। চোখাচোখি হবার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই। কারণ, মানুষটা কখনও ভুলেও এদিকে তাকান না। অতসীর মনে হয়, তবে কি আভিচারিক বিদ্যা বলে কিছু আছে? সেই জ্যোতিষীই কি কোনও তান্ত্রিক বিদ্যার প্রভাবে মনোরঞ্জনের মনে স্ত্রীর প্রতি চিরন্তন তীব্র বিরাগের সূচনা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু, আধুনিক যুক্তিবাদীরা তো তন্ত্রমন্ত্র, বশীকরণ, তুক্‌তাক্ বাণমারা— সবই নস্যাৎ করে দেন।

সেদিন এল সেজ ভাসুরের ছেলে অরুণেশ। তার একমাত্র পুত্র শুভদীপের বিয়ে। অরুণেশের স্ত্রী জয়া বলল— ন' কাকিমা, আপনাকে কিন্তু বধূ বরণ করতে হবে। ছেলেকে গায়ে হলুদ দিতে হবে। অতসী উদাসভাবে বললেন— 'আমি কেন বধূ বরণ করব বৌমা? দিদিভাইদের বল না। তোমাদের কাকা থাকলেও, আমি তো—।' কথা শেষ করতে পারলেন না অতসী। নিরুদ্ধ অশ্রু নামল চোখের কোল বেয়ে। গাঢ় কণ্ঠে জয়া বলল— 'এই বাড়িতে আমি আপনাকে সব থেকে শ্রদ্ধা করি ন' কাকিমা। আপনার এই ত্যাগ, সহিষ্ণুতার কোনও তুলনা হয় না। সীতা সাবিত্রীর দেশেই আপনার মতো মেয়ে জন্মায়। —যারা শুধু দিয়ে গেল, পেল না কিছুই। আপনার আশীর্বাদে আমার বৌমার মঙ্গলই হবে। কথা দিন, আপনি বরণ করবেন?' অতসী ম্লান হেসে বললেন— 'পাগল মেয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে।'

বাসী বিয়ের দিন সকালে লালপাড় গরদের শাড়ি পরে, বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন অতসী। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে অরুণেশ। চলে গিয়েছিলেন অতসী। নববধূকে বরণ করেছিলেন পরম নিষ্ঠাভরে। জয়া তাঁকে না খাইয়ে ছাড়েনি। বৌভাতের দিন সন্ধ্যেবেলা বারবার করে আসতে বলেছে। গাড়ি পাঠাবার কথা বলতেও ভোলেনি।

বৌভাতের সন্ধ্যেবেলা, আলো-ঝলমলে বিয়েবাড়িতে পৌঁছে দেখেন বৌ বসেছে সিংহাসনে। চতুর্দিকে হৈচৈ, হট্টগোল। অতসীর চোখে পড়ল, সিংহাসনের একপাশে গদি আঁটা একটা ইজিচেয়ারে মনোরঞ্জনকে বসানো হয়েছে। মনোরঞ্জনও কি একবার তার দিকেই তাকালেন? অতসী দেখলেন, কখন যেন তিনি এসে পৌঁছে গেছেন, মনোরঞ্জনের অনেকটাই কাছাকাছি। হ্যাঁ। এইবার একটু সময় বুঝে ফাঁক পেয়েই অতসী জিজ্ঞেস করে ফেলবেন, সেই বহু বছর ধরে মনের মধ্যে লালন করা, একান্ত স্পর্শকাতর তিনটি অমোঘ শব্দ—'তুমি কেমন আছ?'

'ন' কাকিমা কনের বাড়ির লোকেদের এবার খেতে পাঠাতে হবে। আমরা বললে তো হবে না। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে আপনার বলাটাই ভালো দেখাবে।' জয়া ততক্ষণে অতসীর হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলেছে— 'হ্যাঁ চল যাচ্ছি।' ফিরে যেতে যেতে এক চরম হতাশা অতসীকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে থাকে। এই লগ্নও পার হয়ে গেল। শুভদীপের মিলনের শুভলগ্নে অব্যক্ত, অশ্রুত হয়ে রইল অতসীর বিষাদমাখা হতাশ্বাস। ■

মনীষী কথা

সংকল্পের প্রতিমূর্তি : বিজ্ঞানী মেরি ক্যুরি

আজ পর্যন্ত নারী হিসেবে তাঁর সাফল্য কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। সারা পৃথিবীতে তিনিই প্রথম মহিলা ডক্টরেট। সারা পৃথিবীতে তিনিই প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী। সারা পৃথিবীতে তিনিই প্রথম মহিলা নোবেল জয়ী। এতো বড়ো সাফল্যের জীবন কাহিনি শুনলে বুক ভরে যায়। কিন্তু তার পিছনে বহু কান্নার ইতিহাস লুকিয়ে আছে। তিনি হলেন মেরি কুরি। দু'বার তিনি নোবেল পেয়েছেন।

১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর তাঁর জন্ম। পোল্যান্ড তখন পরাধীন দেশ। রাশিয়ার দখলে। জারের লুটপাট আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেশের মানুষ। ক্যুরির মা-বাবা দু'জনেই শিক্ষক। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দু'জনেরই চাকরি কেড়ে নেয় রুশ পুলিশ। ফলে চরম অর্থ সঙ্কটে পড়েন তাঁরা পাঁচ ভাই-বোন। প্রত্যেকেই মেধাবী। তারা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয় এক বছর দু'জন পড়াশুনা করবে, বাকিরা কাজকর্ম করে সংসারের খরচ জোগাবে। কিন্তু তাতেও অভাব ঘোচে না। অনাহার অপুষ্টিতে চতুর্থ বোন মারা যায়। তারপরই মা যক্ষায় আক্রান্ত হলেন। বিনা চিকিৎসায় মা মারা গেলেন। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ ক্যুরি প্রতিজ্ঞা করল চোখের জল ফেলে দুর্বল হলে চলবে না। লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ছেড়ে দিল গির্জায় যাওয়া। কারো ওপর নির্ভরশীল হতে চায় না সে, এমনকী ঈশ্বরের ওপরও নয়। ক্যুরি নাস্তিক হয়ে গেলেন।

১৮৯১ সাল। পোল্যান্ডে মেয়েদের তখন উচ্চশিক্ষার অধিকার নেই। চলে গেলেন প্যারিস। বড়দির কাছে। জামাইবাবু নামকরা ডাক্তার। তাঁর পরামর্শ নিয়ে ভর্তি হলেন সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শহরের একপ্রান্তে এক বাড়ির পাঁচতলার ঘরে ভাড়া নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করলেন। দিদি-জামাইবাবু চাইছিলেন তাদের বাড়িতেই ক্যুরি থাকুক। কিন্তু ক্যুরি কারো ওপর নির্ভরশীল থাকতে চান না।

সেই দিনগুলো যে কত ভয়ঙ্কর তা বর্ণনাতীত। খুব ভোরে বালতি করে নীচে থেকে জল তোলা। দুপুরে একটি হোটেলে থালা-বাসন মাজা। সন্ধ্যায় টিউশানি পড়ানো। জুতো কেনার পয়সা নেই, খালি পায়েই কলেজ। শীতের গাউন নেই, তাতেও কোনও দুঃখ নেই। এত ধকলে শরীর মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে। তবু ডোন্ট কেয়ার। একবার তো মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন। সেবার ডাক্তার জামাইবাবুর চিকিৎসায় রক্ষা পেলেন। এত কষ্টের মধ্যে তিনি ১৮৯৩ সালে পদার্থবিদ্যায় মাস্টার ডিগ্রি লাভ করলেন। তারপর ডক্টরেট করে গবেষণায় মগ্ন হলেন।

১৯০৩ সাল। স্বামী পিয়েরের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পেলেন। সেদিন তাঁর কী আনন্দ। খুশিতে চোখের জল বাঁধ মানে না। বছর দুই না কাটতেই সেই আনন্দে ভাটা পড়ল। পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন স্বামী পিয়েরে ক্যুরি। আবার দুঃখ, আবার ঝড়। আবার শোক। ছোট্ট দুটি মেয়েকে বুকে আগলে আবার সামনে এগিয়ে চলা।

১৯০৮ সাল। মানবজাতিকে দিলেন রেডিয়াম ও পোলোনিয়ামের সন্ধান। দুরারোগ্য ক্যানসার রোগের ওষুধ। মানব সভ্যতার আশীর্বাদ। স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯১১ সালে পেলেন দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার। রেডিয়াম নিয়ে গবেষণা করতে করতেই তাঁর শরীরে বাসা বাঁধে মারণরোগ ক্যানসার। ১৯৩৪ সালে ৪ জুলাই ফ্রান্সেই তাঁর দেহাবসান হয়।

(সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

কাঞ্চিপুরম্

তামিলনাডু রাজ্যের দ্য গোল্ডেন সিটি অব আ থাউজেন্ড টেম্পল্‌স হলো কাঞ্চিপুরম্। দক্ষিণ ভারতের কাশী নামেও প্রসিদ্ধ। ভারতের সাত মোক্ষপুরীর মধ্যে কাঞ্চিপুরম্ অন্যতম। অতীতে এক হাজারটি মন্দির, দশ হাজারটি শিবলিঙ্গ ছিল ১১.৬ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপ্ত কাঞ্চিপুরমে। কাঞ্চিপুরমের আর এক দেবতা বিষ্ণু। তাই আগে শিব কাঞ্চি ও বিষ্ণু কাঞ্চি নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম মন্দির কৈলাসনাথ কাঞ্চিপুরমেই অবস্থিত। আদি শঙ্করাচার্যের কামাকোঠি মঠ, মঠের বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাধি মন্দির রয়েছে এখানে। এছাড়া,একাম্বরেশ্বর মন্দির, শ্রীকামাক্ষী আম্মান মন্দির, শ্রীবৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির, শ্রীদেবরাজাস্বামী মন্দির, শঙ্করমণ্ডপম্ ইত্যাদি বহু মন্দির রয়েছে এখানে।

জানো কি?

ছদ্মনাম

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্ত।
- প্যারীচাঁদ মিত্র—টেকচাঁদ ঠাকুর।
- সমরেশ বসু—কালকূট।
- চারুচন্দ্র চক্রবর্তী—জরাসন্ধ।
- বিমল ঘোষ—মৌমাছি।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—অনিলা দেবী।
- কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম পেঁচা।
- বিনয় মুখোপাধ্যায়—যাযাবর।
- রাজশেখর বসু—পরশুরাম।

ভালো কথা

জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণ সাজো

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর কয়েকদিন আগে আমাদের ইলা ঘোষ সরস্বতী শিশুমন্দিরের বড় দাদাভাই বললেন বিদ্যালয়ে জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন করা হবে। সবাইকে কৃষ্ণ সাজতে হবে। সেদিন সকালে মা আমাকে কৃষ্ণ সাজিয়ে স্কুলে নিয়ে যায়। বেশিরভাগ ভাই-বোন কৃষ্ণ সেজে এসেছে। প্রথমে পথসভা হলো। দাদাভাই দিদিভাইরা কৃষ্ণের অনেক গল্প বললেন। তারপর শোভাযাত্রা। বিশাল শোভাযাত্রা। শুধু কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ। অবশ্য সবার সঙ্গেই মা-বাবা রয়েছে। দাদাভাই দিদিভাইরাও আছেন। রাস্তার দু'ধারে অনেক মানুষ ভিড় করে দেখছিল। আমাকে সত্যিকারের কৃষ্ণ মনে হচ্ছিল। শেষে মায়েদের আনা নাড়ু খেলাম। দারুণ আনন্দ হচ্ছিল। বাড়িতে এসে দেখি আমার ছোটো ভাইকেও দিদা কৃষ্ণ সাজিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণের সাজ খুলতেই ইচ্ছা করছিল না।

উদিত নারায়ণ দত্ত, প্রথম শ্রেণী, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

শরৎ

বিবেক রায়, একাদশ শ্রেণী, বক্সিরহাট, কোচবিহার।

শরৎ মানেই পুজোর আমেজ
শরৎ মানেই খুশি
শরৎ মানেই মহালয়া
পুজোর লম্বা ছুটি।
শরৎ মানেই আকাশ ভরা
সাদা মেঘের ভেলা
শরৎ মানেই ঢাকের তালে
মেতে ওঠার পালা।

শরৎ মানেই সবুজ মাঠের
শান্ত শীতল হাওয়া
শরৎ মানেই কাশ শিউলির
গন্ধ শুধু পাওয়া।
শরৎ মানেই অনেক মজা
অনেক ভালোর স্বাদ
শরৎ মানেই খুব আনন্দ
মন খারাপ সব বাদ।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়
নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ২৬

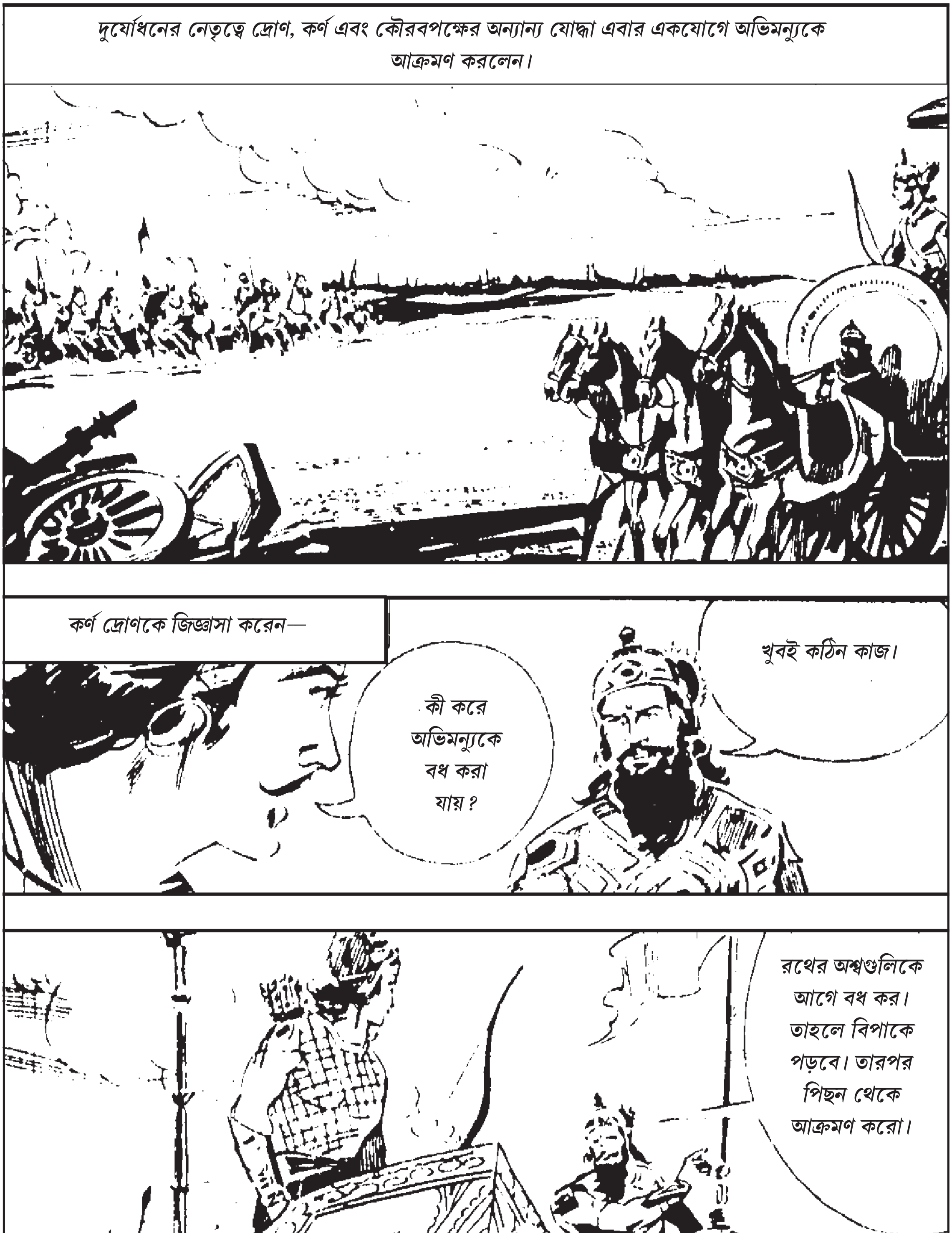

পুস্তক প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে একটি নবতর সংযোজন

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

প্রতি বছর বাংলা ভাষায় বোধ করি সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপর। এই গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ সাহিত্যে নবতর সংযোজন। লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, সারদা দেবীর সঙ্গে পরিণয়, দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির মন্দিরে কালীপূজার পূজারি হিসেবে নিযুক্ত, সেই সূত্রে ত্রিকালজ্ঞ সাধু হিসেবে খ্যাতি, অজস্র ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্য, সর্বশেষে তাঁর তিরোধান— লেখক জহর মুখোপাধ্যায় অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে এই নাতি বৃহৎ গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন যার প্রশংসা না করে পারা যায় না। সমস্ত গ্রন্থটি গল্পচ্ছলে বলা যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনকে আবিষ্ট করে রাখে। এমনই লেখকের লেখার জাদু। মজার কথা, অন্যান্য জীবনী গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থে ধারাবাহিকতা নেই— অর্থাৎ সাল তারিখ দিয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা নেই। অথচ আদ্যন্ত মনোগ্রাহী। মনে হয় জীবনী পড়ছি নয়, পড়ছি উপন্যাস।

লেখক দেখিয়েছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যুগপুরুষ হওয়া সহজ ছিল না। তাঁকে পদে পদে সন্দিগ্ধ ভক্তদের কাছে পরীক্ষা দিতে হয়েছে— রানি রাসমণি, বিদ্যাসাগর, গিরীশ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ কে না তাঁকে যাচাই করে নিয়েছেন। প্রতিটি পরীক্ষা ছিল কঠোর— কিন্তু কী অসাধারণ ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে তিনি সবাইকে তাঁর পদতলে এনে ফেলছেন। পরীক্ষা দিতে গিয়ে একবারও বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করেননি— দাম্ভিকতা তো নয়ই। কখনও তিনি বলেননি আমি তোদের গুরু— আমাকে গুরু বলে মানো।

তিনি ছিলেন অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার। হাসছেন ও হাসাচ্ছেন। কত অনায়াসে তিনি জটিল সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন। এজন্য তিনি শাস্ত্রের বিধান মানেননি। দক্ষিণেশ্বরে কালীমূর্তির একটি অঙ্গ ভেঙে গেছে। রাসমণির পরিবারের সবাই এটি অলুক্ষণে মনে করে। তাদের ঘুম চলে গেছে। তাঁরা এ মূর্তি বিসর্জন দেবার কথা ভাবছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিধান দেন তোদের কারোর পা ভেঙে গেলে কি তাকে বিসর্জন দিতিস।

আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের উপর যত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এটি তার সারাৎসার। কী নেই এই গ্রন্থে? সারদামণি ও রামকৃষ্ণের জীবনী শুধু নয়, তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাহিনি, তাঁদের জন্মস্থানের পরিচয়, তাঁদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক কোনও কিছুই এই গ্রন্থে বাদ পড়েনি। বাদ পড়েনি সারদামণি ও রামকৃষ্ণের জন্ম সময়ের সপুঙ্খ বিবরণ। লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের হঠাৎ হঠাৎ ক্ষিধে পাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করতে ভোলেনি। তাঁর ক্ষিধে পেলে তাঁকে ধরে রাখা দায়। তখন সারদাদেবীকে যত রাতই হোক তাঁর ক্ষিধে মেটাতে ব্যস্ত হতে হতো।

এটি হলো শ্রেষ্ঠ জীবনী রচনার বৈশিষ্ট্য— বড় ঘটনার মতো ছোটো ঘটনাকে সমান মূল্য দেওয়া। সারা গ্রন্থ ফ্ল্যাশব্যাকে ভর্তি— কাহিনি একবার সামনে যাচ্ছে একবার পিছনে। সব মিলিয়ে গ্রন্থটি অসাধারণ। সেই সঙ্গে অসাধারণ মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গোধূলি আলো নিজ গুণে পাঠক সমাজে স্থান করে নেবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গোধূলি আলো।
লেখক : জহর মুখোপাধ্যায়।
প্রকাশ : কৃতি। প্রথম প্রকাশ : ২০১৮।
মূল্য : ২২০ টাকা।

কাহিনির মোড়কে ইতিহাস

সুদীপ্ত বসু

গ্রন্থের মুখবন্ধে বলা হয়েছে উপন্যাস। কিন্তু গ্রন্থ পাঠ শুরু করার অব্যবহিত পর থেকেই মনে হয় অভিজিৎ চৌধুরীর অনুগামিনী বস্তুত কাহিনির মোড়কে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের ইতিহাস। উপন্যাসের সময়কাল ১৮৮৬-র পরের কয়েকটি বছর। সদ্য দেহ রেখেছেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরের দুই প্রধান শিষ্য গিরীশ এবং নরেন তখন জীবনগুরুর বিয়োগব্যথায় ব্যাকুল। দু'জনেরই উদ্দেশ্য ঠাকুরের নির্দেশিত পথে চরিতার্থতার সন্ধান। কিন্তু গিরীশের ঠিকানা হাটখোলা। মাথায় সর্বক্ষণ থিয়েটারের ভাবনা। আর নরেনের ঠিকানা দক্ষিণেশ্বর। অভিজিৎ বলতে চেয়েছেন, গিরীশ এবং নরেন একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। গিরীশ চাইতেন নরেন হাটখোলায় আসুন আর নরেন চাইতেন গিরীশ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসুন। এই টানাপড়েনকে উপজীব্য করে এগিয়েছে কাহিনি। পড়তে পড়তে চরিত্রগুলিকে রক্তমাংসের বলে ভ্রম হয়। অভিযোগ একটিই। লেখক যথেচ্ছ ইংরেজি শব্দ এবং বাক্য ব্যবহার করেছেন। একটি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে যা কোনওভাবেই মানানসই নয়। এইটুকু বাদ দিলে অনুগামিনীর লেখক হিসেবে অভিজিৎ চৌধুরীর প্রশংসা করতেই হয়। একটি বিপুল পরিশ্রমসাধ্য কাজকে তিনি সহজ ভাষাভঙ্গী এবং বিন্যাসে পরিবেশন করেছেন। তার জন্য অবশ্যই লেখকের ধন্যবাদ প্রাপ্য।

অনুগামিনী। লেখক : অভিজিৎ চৌধুরী। মূল্য : ২০০/- টাকা। প্রকাশক : আনন্দ পাবলিশার্স।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা প্রয়াত সুভাষ চন্দ্র হালদারের ইচ্ছানুসারে তাঁর সহধর্মিণী তথা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কার্যকর্ত্রী আলপনা হালদার তাঁদের সুযোগ্যপুত্র অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন রাজ্য সম্পাদক সুবীর হালদারের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি স্বরূপ পাঁচ শতক জমি ও পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্পণ করেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পালের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ ও শুভকামনা জানান সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সহ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, এবিভিপি-র তৎকালীন রাজ্য সংগঠন সম্পাদক কিশোর বর্মন, ধর্মজাগরণ বিভাগের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ বিশ্বনাথ সাহা, এবিভিপি-র পূর্বতন ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, ভারতীয় জমতা পার্টির রাজ্য নেতা শমীক ভট্টাচার্য -সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার পূর্বতন বৌদ্ধিক প্রমুখ কলিগ্রাম নিবাসী ডাঃ দেবাশিস রায়চৌধুরীর কন্যা দেবদ্যুতির শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে গত ২২ জুলাই ঠাকুমা মৃদুলা রায়চৌধুরী মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক দেবব্রত দাসের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৭ জুলাই বীরভূম জেলা সঙ্ঘচালক তোলারাম মণ্ডল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন বীরভূম বিভাগ কার্যবাহ তথা দক্ষিণবঙ্গ সহপ্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডলের হাতে।

এই অনুষ্ঠানে ক্ষেত্র শারীরিক প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

তারকেশ্বর জেলার আরামবাগ নগর ব্যবস্থা প্রমুখ দেবদাস ঘোষ গত ২০ জুলাই তাঁর গৃহ প্রবেশ উপলক্ষ্যে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা কার্যবাহ সুনীল বাগের হাতে।

* * *

গত ২২ জুলাই তাকেশ্বর জেলার পুরশুড়া খণ্ডের সেবা প্রমুখ অমিত ঘোষ তাঁর পুত্র আয়ুষ্মানের ‘মুখেভাত’ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের খণ্ডের ব্যবস্থা প্রমুখ জয়দেব কুণ্ডুর কন্যা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রথম বর্ষ শিক্ষিতা সমাপ্তি কুণ্ডুর শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁর দাদা শচীনন্দন কুণ্ডু জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে জেলা সেবা প্রমুখ শিশির গঙ্গোপাধ্যায়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

মারণরোগ ডেঙ্গু জ্বর এবং বঙ্গদেশেরই বিস্মৃতপ্রায় এক অতীত

দেবীপ্রসাদ রায়

ডেঙ্গু জ্বর ঠিক এই মুহূর্তে দিশাহারা করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক মহলকে, রাজ্য প্রশাসনকে এবং রোগাক্রান্ত এবং রোগ আক্রমণের ভয়ে ভীত আপামর মানুষকে। ইতিপূর্বে সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অভিজ্ঞতা আছে ফ্লু'র প্রকোপ নিয়ে, এনকেফেলাটিস নিয়ে, ভাইরাল জ্বর নিয়ে অথবা বিমূঢ় করা অজানা জ্বর নিয়ে। এর ফলে কিছুদিন উদ্বেগে কেটেছে এবং নানা ব্যবস্থা গ্রহণে সেগুলি নিয়ন্ত্রণেও এসেছে। কিন্তু এবারের ডেঙ্গু নিয়ে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা খুব বেড়েছে, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে। দুশ্চিন্তার কারণ সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারগুলির নিষ্ক্রিয়তা, রাজ্য প্রশাসনের লুকোচুরি খেলা, চিকিৎসক মহলে এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারে প্রয়াসহীনতা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে। ডেঙ্গু পরীক্ষার 'কিট' নেই— রোগীর সঙ্গিন অবস্থায় অত্যাবশ্যক রক্তের প্লেটলেটের যোগান ব্যবস্থাও নেই বলেই জানা যাচ্ছে। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন কলকাতা এক সময় এশিয়া তথা বিশ্বের সম্ভ্রম আদায় করেছিল। মশা বা পতঙ্গ গবেষণা বিভাগ বা এদের দ্বারা বাহিত রোগ নিয়ে অতীতে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে যেগুলি বন্ধ। পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব দীর্ঘদিন পড়ে রয়েছে। ফলে দ্রুত মহামারি আকার ধারণ করছে ডেঙ্গু জ্বর।

অথচ এই স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে প্রতিষ্ঠাতা সিওনার্ড রজার্স, রোনাল্ড রস (ম্যালেরিয়া-খ্যাত এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত), ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (কালাজ্বরের সার্থক ওষুধ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারের জন্য একাধিকবার মনোনয়নপ্রাপ্ত) প্রমুখের

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

গবেষণায়। ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের ব্যাপক আক্রমণের প্রেক্ষিতে যে ক্ষেত্রগুলি নিয়ে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সেগুলি হলো :

(১) কালাজ্বর, (২) ডেঙ্গু এবং ডেঙ্গু হেমারেজিক জ্বর, (৩) সাপে কাটার জন্য প্রতিষেধক এবং ক্যান্সার, (৪) ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ও ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট, (৫) সাধারণ ট্রপিক্যাল রোগ।

ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য, সরকারি আনুকূল্য ছাড়াও রোগাক্রান্ত মানুষের যন্ত্রণা লাঘব ও নিরাময়ের জন্য এক স্পর্শকাতর মরমি মন নিয়ে ব্যক্তিগত একাগ্রতা নিয়ে নিরলস সাধনায় যে অসাধ্য সাধন করা যায়, কালাজ্বরের নিরাময়কারী ওষুধ আবিষ্কর্তা ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৩-১৯৪৫) যাঁকে স্মরণ ও মনন করা আবশ্যিক ছিল। আজকের এই ডেঙ্গুজনিত সংকটকালে তাঁকে নিয়ে একটু আলোচনায় আসি। উপেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং অধ্যাপক মেডলারের কাছে রসায়ন শাস্ত্রের পাঠ নিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এম.বি. পাশ করেন ১৯০০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এম.ডি. করেন ১৯০২ সালে, পিএইচডি করেন ১৯০৪ সালে। ইতিমধ্যে ১৮৯১ সালে তিনি প্রভিন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯০৫ সালেই তিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে (যা পরে এন আর এস মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল নামে খ্যাতনামা হয়) যোগ দেন ওষুধবিষয়ক শিক্ষক ও চিকিৎসক হিসেবে, এখানেই তিনি কালাজ্বর নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। কালাজ্বর সেই সময় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এক মারাত্মক সংক্রামক রোগ হিসেবে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। জানা গেল প্রোটোজোয়ান প্যারাসাইট এই রোগের কারণ। সংক্রামিত হয় বালি মাছি (sand fly) নামক এক প্রকার মাছির দ্বারা। ছোটো বড়ো সবারই এই রোগ হতে পারে। লক্ষণ হলো— জ্বর, লিভার ও প্লিহার বৃদ্ধি, রক্তহীনতা, চর্মরোগ, অঙ্গহানি, সামান্য ক্ষত থেকেও অত্যধিক রক্তপাত ইত্যাদি। হাত পা কাঠির মতো হয়ে যাওয়া, শেষে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। ১৮৮১ সালের পর কোনো কোনো বছর লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়। পার্বত্য অঞ্চল কোথাও কোথাও একেবারে জনশূন্য হয়ে যায়। ১৮৭৬ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায় বর্ধমানের জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৭৫০ থেকে ৫০০-তে নেমে এসেছিল কালাজ্বরের দাপটে। কালাজ্বর মহামারি রূপ ঘোষিত হয়।

১৮৩২ সাল থেকে এবং কম বেশি সারা পৃথিবীই এই রোগের প্রকোপে বিপন্ন হয়। ব্রিটিশ সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার পৃথিবী ব্যাপী হচ্ছিল। রোগটির চরিত্র নির্ধারণ করাও কঠিন হচ্ছিল। কখনো মনে হলো ম্যালেরিয়া কিন্তু তা নয়, কারণ এই রোগে কুইনাইন কার্যকরী হলো না। তবে কালাজ্বরের জীবাণু আবিষ্কারে রোনাল্ড রসের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর

প্রয়াসে লেইসমান ও ডোনেভাতানের সহযোগিতায় এই জীবাণু চিহ্নিত হয় 'লেইসম্যানিয়া- ডোনেভানি'। নানারকম 'দেখা যাক কী হয়' পদ্ধতি প্রয়োগ করে অবশেষে টাটারিক অ্যাসিডের সঙ্গে পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিমনি (ল্যাটিন নাম স্টিবিয়াম) যৌগ দিয়ে ইজেকশন ব্যবহার করে কালাজ্বর রোগের কিছুটা ইতিবাচক ফল পাওয়া গেল। রজার্স কলকাতার রোগীকে টাটার এসেটিক ইনজেকশন দিয়ে কিছুটা ফল পেলেও তা আবার বিষক্রিয়ার উদ্ভব ঘটাল। হার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকল, বমি হতে থাকল। ভালো বিকল্প ভেবে পটাসিয়াম সরিয়ে সোডিয়াম ব্যবহার করে তৈরি হলো সোডিয়াম অ্যান্টিমনি টার্টেট। কিন্তু তেমন সুরাহা হলো না। এটা একটা দীর্ঘকালীন চিকিৎসা। রোগীরা পালাতে থাকল প্রয়োগ স্থল থেকে। দিশেহারা হলেন চিকিৎসক বিজ্ঞানীরা। ঠিক এইখানেই উপেন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলেন উপযুক্ত ভাবে কার্যকরী বিকল্প বার করতে। অসাধারণ জেদ ও একাগ্রতা নিয়ে হাসপাতালে অধ্যাপনা ও চিকিৎসার দায়িত্ব সম্যকভাবে পালন করেও তিনি ব্রতী হলেন কালাজ্বরের সার্থক ওষুধ আবিষ্কারে।

১৯১৫ সাল থেকে ক্যাম্পবেল হাসপাতালের ছোট্ট ঘরটিতে উপেন্দ্রনাথ এক আপাত অসম্ভব কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ছোট্ট ঘর, জল আলোর সুব্যবস্থা নেই, তবুও তিনি কাজ শুরু করলেন। অ্যান্টিমনিকে চূর্ণ করে ক্লোরোফরম দ্রব করে কলয়ডাল অ্যান্টিমনি তৈরি করলেন। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে অ্যান্টিমনিকে চূর্ণ করে তাকে দ্রব অবস্থায় আনতে উপেন্দ্রনাথকে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। অ্যান্টিমনির এই নতুন প্রকরণ বিদেশি বৈজ্ঞানিকের প্রস্তুত পদার্থের তুলনায় বেশিদিন বিশুদ্ধ থাকত। কিন্তু এটা করাও কষ্টসাধ্য ছিল। উপেন্দ্রনাথ যা করলেন তার পথ দেখিয়েছিলেন জার্মান রাসায়নিক এরলিক। রাসায়নিক পদ্ধতিতে এমন যৌগ পদার্থ তৈরি করতে হবে যা রোগীর শরীরে ঢোকালে রোগবীজাণুকে ধ্বংস করবে। এই প্রয়াসেই আবিষ্কৃত হলো salvarson নামে ওষুধ। ৬০৬ বার পরীক্ষার পর এটি প্রয়োগযোগ্য বিবেচিত হয় বলে এর নাম হয়ে যায় ৬০৬। ঠিক এই ভাবেই আফ্রিকার ঘুম রোগের ওষুধ অ্যাটোক্সিল বের করেন এরিক আর্সেনিক ঘটিত যোগ হিসেবে। $NH_2C_6H_6A_SO$ Na(OH), $5H_2O$, As হলো আর্সেনিক এবং ঠিক এই আদর্শ অনুসরণ করেই উপেন্দ্রনাথ তাঁর গবেষণার সূত্র খুঁজে পান। তাঁর মনে হলো ওই অ্যাটোক্সিলের মতো একটি যৌগ পদার্থ যদি তৈরি করা যায় আর্সেনিকের পরিবর্তে অ্যান্টিমনি ব্যবহার করে তাহলে তা কালাজ্বরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাঁর এই ভাবে এগিয়ে যাবার মূলে দুটি কারণ ছিল—

(১) বিখ্যাত চিকিৎসক ম্যানসন দেখিয়েছিলেন যে ঘুম রোগের বীজাণু ও কালজ্বরের বীজাণু বহুলাংশে একই রকম।

(২) অ্যান্টিমনি প্রয়োগেই কালাজ্বর বীজাণু নাশ হতে পারে। কারণ রাসায়নিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আর্সেনিক ও অ্যান্টিমনি একই পর্যায়ভুক্ত মৌলিক পদার্থ।

সুতরাং এরকম একটা যৌগ কালাজ্বর চিকিৎসার জন্য তৈরি করা যেতেই পারে। এই গবেষণার জন্য উপেন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড অ্যাসোসিয়েসনের কাছে কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। দাবি মতো না পেলেও প্রাথমিক ভাবে উপেন্দ্রনাথ অ্যাটোক্সিল জাতীয় অ্যান্টিমনি ঘটিত এক যৌগ প্যারাস্টিবানিলিক অ্যাসিড $NH_2C_6H_6$ SbONa (OH), (Sb-- হলো অ্যান্টিমনি) তৈরি করলেন। এটির প্রয়োগে কালাজ্বরে কাজ হলো কিন্তু রোগী ভীষণ যন্ত্রণা ভোগের সম্মুখীন হলো। এই যন্ত্রণাবোধ কমাতে নানা উপায় নিয়ে তিনি পরীক্ষা চালালেন। ব্যর্থতার ব্যাপক হতাশার মধ্যে হঠাৎ তাঁর মনে হলো 'ইউরিয়া' নামক এক জৈব পদার্থের তো বাহ্যজ্ঞান লোপ করানোর ক্ষমতা আছে। যেমন কুইনিন ইউরিয়া এটি কুইনিনের পরিবর্তে ব্যবহার করে দেখা গেল সাধারণ কুইনিনের অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া নিবারণ করা সম্ভব। এই ভাবনাচিন্তায় ১৯২০ সালে উপেন্দ্রনাথ তাঁর প্যারাস্টিবানিলিক অ্যাসিডের সঙ্গে ইউরিয়া মিশ্রণ করে এক বিশেষ যৌগ লবণ তৈরি করলেন এবং এটিই 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' নামে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর বিশ্বখ্যাত কালাজ্বর চিকিৎসার ওষুধ। এই ভাবে পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর গবেষণা সফল হলো। এর বিবরণী উপেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থ 'kalawzar and its treatrbut'-তে দিয়েছেন। আজকের ডেঙ্গু প্রসঙ্গে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীকে কেন নিয়ে এলাম তা নিশ্চয়ই পাঠক সাধারণ এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। উপযুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অর্থসাহায্য সবই দরকার কিন্তু সবাচাইতে যেটি বেশি দরকার তা হলো ব্যক্তিগত প্রবল ইচ্ছে, উদ্যোগ এবং সব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ার সাহস। এখন প্রায় সবই আছে কিন্তু অভাব আছে ওই প্রবল ইচ্ছের, জেদের। প্রতিভা নেই তা নয়। কিন্তু ভোগবাদী জীবনচর্যার চাহিদাকে এড়িয়ে মানবকল্যাণে কাজ করার তীব্র ইচ্ছের অভাব— কণ্টকাকীর্ণ পথে বাঁচার জন্য লড়াকু মনোভাবের অভাব।

উপেন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁর ক্যাম্পবেল হাসপাতালে আবিষ্কৃত ওষুধের প্রয়োগ করলেন। প্রাথমিক সাফল্য দেখে অন্য ডাক্তাররাও এর সাহায্যে চিকিৎসা শুরু করলেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অভিজ্ঞতা (তৎকালীন) প্রসূত লেখা থেকে জানা যায় :

অতি সামান্য ওষুধ ইনজেকশানে তিন সপ্তাহের মধ্যেই রোগী একেবারে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করছে। অসমে কালাজ্বরে ব্যাপক চিকিৎসাকেন্দ্রে এই ইনজেকশন ব্যবহার করে এর অব্যর্থ গুণ প্রমাণিত হলো। অসমে কালাজ্বর চিকিৎসার প্রধান ব্যবস্থাপক 'ইন্ডিয়া মেডিক্যাল সার্ভিসেস'-এর মেজর শর্ট, ব্রহ্মচারীর ওষুধের শ্রেষ্ঠত্ব আবিসম্বাদিত বলে ঘোষণা ও প্রচার করলেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, এই মারণ রোগের চিকিৎসার খরচ খুবই কম ছিল--- সাধ্যের মধ্যে ছিল। ফলে কুলিমজুরদের পক্ষে এই ওষুধ ছিল ভগবানের বরস্বরূপ।

অনেকে মনে করতেন, বিশেষ করে

নেটিভদের বিজ্ঞান প্রতিভায় আস্থাহীন ইউরোপিয়ান চিকিৎসকরা তৎকালীন আর এক ওষুধ জার্মানীর 'নিউস্টিবোসান'কে উপেন্দ্রনাথের ইউরিয়া স্টিবামাইনের চেয়ে ভালো মনে করতেন। অথচ অসমে স্বাস্থ্য বিভাগ জার্মান ওষুধের ব্যবহার তুলে দিয়ে ইউরিয়া স্টিবামাইনকেই বেছে নিয়েছিল। ১৯২৩ সাল থেকে কালাজ্বর রোগীর সম্যক গণনা শুরু হয়। তখন আরম্ভ হয়েছে ব্রহ্মচারীর ইউরিয়া স্টিবামাইনের প্রয়োগ। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের অসমের স্বাস্থ্য বিভাগের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১০ বছরে সওয়া তিন লক্ষের উপর রোগী বেঁচে গেছে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৬-এ মৃত্যুসংখ্যা নেমে এসেছিল ৫৩৩৫ থেকে ৭৫৫-তে। ১৯২৯ সালে সুইডিশ অ্যাকাদেমির দু'জন সদস্যকে Hans Christian Jacobaus এবং Goran Liljestrand সুইডেনের Karolinka Academy থেকে ডেকে পাঠানো হয় ভারত থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কারের জন্য কোনো মনোনয়ন দেওয়া যায় কিনা। সে মনোনয়ন পেয়েছিলেন ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী তাঁর কালাজ্বরের ওষুধ Wreastebanire এবং একটি নতুন রোগ PKDL (Post Kalazar Dernal Leishmanoid) চিহ্নিত করার জন্য। ওই Karzlinsha Academy থেকেই মনোনীত বরাবর চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়ে আসেন। কিন্তু আবার সেই পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি, নোবেল প্রাইজ গেল Christian Bigkman এবং Fredriek Goaland wopkins-দের কাছে। না, লক্ষ লক্ষ মানুষের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু রোখার জন্য নয়, পরন্তু মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ভিটামিন আবিষ্কারের জন্য। সেই একই ঘটনা যেমনটা ঘটে ছিল মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, ডাঃ শম্ভু প্রমুখের ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, ইউরোপিয়ান ডাক্তাররা অধিকাংশই এই নেটিভ ভারতীয় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর কোনো কৃতিত্ব স্বীকার করতে চাননি। অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে অসমের। মজার মজার কবিতা দিয়ে যিনি আবালবৃদ্ধবণিতা বাঙালিকে হাসিয়ে গেছেন, আনন্দ দিয়ে গেছেন, আশ্চর্য এক কল্পলোকে নিয়ে গেছেন সেই সুকুমার রায় যখন কালাজ্বরে শয্যাশায়ী— ইউরিয়া স্টিবামাইন বেরিয়ে গেছে, কিন্তু সুকুমার রায়ের চিকিৎসা হতে দেওয়া হয়নি। নেটিভ ডাক্তারের 'ওষুধ' দেওয়ার ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সুকুমার রায় মারা যান। অথচ ১৯২২ সালের অক্টোবরেই ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ওষুধের অভাবিত সাফল্যের কথা। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু প্রমুখের মতো উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীও দেখিয়ে গেছেন 'আমরাও পারি' প্রত্যয়। আজ এই সময়ে 'ডেঙ্গু'র বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যোগ্য মানুষদের বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যই সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক 'উপেন্দ্রনাথ স্মরণ'।

ব্যক্তিগত ভাবে এই উদ্বুদ্ধায়ন প্রয়াস নিশ্চিতভাবে আস্থা প্রদায়ক —এরকম পরিস্থিতি এখন আর নেই। প্রতিষ্ঠানগত ভূমিকাই এখন প্রধান এবং সাফল্যের সমীপবর্তী হতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন' নিয়ে সমালোচনা করতে হয়েছে তা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাই এখন গুরুত্বপূর্ণ এবং জনস্বার্থে তার উপরই নির্ভর করতে হবে আমাদের। তাই ২০১৭, সালের ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনটিকেই যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এর কার্যসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে হবে। পতঙ্গবাহিত রোগ সারা বিশ্বেই সমস্যা সৃষ্টি করেছে— শুধু ভারতে, পশ্চিমবঙ্গেই তা কিন্তু নয়। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে হলে কোনো সত্য গোপন করা বা ডেঙ্গির প্রকোপ বৃদ্ধিকে রাজনৈতিক বিষয়ের পরিণত করাটা মোটেই অভিপ্রেত নয়। কারণ তাতে বিপদ থেকে বাঁচবে মানুষ। প্রতিদিন দূরদর্শনে, কাগজে ডেঙ্গির ক্রমবর্ধমান সংক্রমণটা বাস্তব সত্য। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গবেষণা পরিকাঠামোকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পূর্ণাঙ্গ করতে হবে, পতঙ্গবিদ বিভাগকে পূর্ণমাত্রায় চালু করতে হবে। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার কোনো অবকাশ নেই এখন। ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকাগুলিতে পতঙ্গবিদদের সরেজমিন তদন্ত চাই। কী ধরনের মশা ওই স্থানগুলিতে ডেঙ্গু বা অন্যান্য ভাইরাস বহন করছে তার, মশাগুলির ভাইরাল লোড কত তার বিশ্বস্ত তথ্য চাই। এখনো জলজমা নোংরা জায়গা থাকছে কেন? তার জন্য দায়িত্ব কার— এনিয়ে চাপান উতোরের কোনও সুযোগ নেই। এখন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত 'জরুরি অবস্থা' জ্ঞানে সে জায়গাগুলিকে দূষণ মুক্তিকরণ চাইই চাই। ভোটমুখী বক্তৃতার প্রতিযোগিতা নয়, পাড়ায় পাড়ায় ডেঙ্গু-সম্ভাবনাপূর্ণ জায়গাগুলিকে পরিশুদ্ধিকরণে নিজেদের জনসংযোগ ক্ষমতা দেখান, তাহলেই এ সংকট দূর করা যাবে।

সব শেষে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর একটি বার্তা তুলে ধরি। জানি না আমাদের মতো দেশে সাধারণ মানুষের আজকের এই অবস্থার কথা তিনি মানসচোখে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা। ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, না, মেডিক্যাল সায়েন্সের কোনো আশ্চর্য অগ্রগতির কথা নয়। ভবিষ্যতের জন্য কোনো দিগদর্শন নয়, তিনি বললেন পুষ্টি নিয়ে বায়োকেমিস্ট্রির গবেষণার কথা, যাতে তাঁর অভিজ্ঞতামতো, সাধারণ মানুষের জন্য সয়াবিন, অঙ্কুরিত ছোলা, চিনেবাদাম দিয়ে মাসে (তখনকার বাজারদর মোতাবেক) পাঁচ থেকে সাত টাকার মধ্যে সুষম খাদ্য লভ্য হয়— এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। বলেছিলেন পয়ঃপ্রণালী ও পুষ্টি, এ দুটিকে সব দেশে হাতে হাত ধরে চলতে হবে, বিশেষত ভারতে যখন এত বিভিন্ন রকম মহামারীর প্রভাব। মহামারিতে আক্রান্ত হলে অপুষ্টি দেখা দেয় ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। জীবাণু বা জৈব রসায়ন নয়, বেঁচে থাকার মতো আহার, পরিষ্কার বাসস্থান এগুলিই সর্বাগ্রে দরকার অর্থাৎ সাধারণ লভ্য পুষ্টিকর খাবার, এক দূষণমুক্ত পরিবেশে বাস— এটিই যেন নাগরিক প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হয়। এই বার্তাই আমাদের সাধারণ মানুষের মননে এবং রাজ্যের প্রশাসনে জাগরুক থাকা দরকার।

(লেখক বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান)

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের রাজ্যস্তরের একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ক্রীড়া জগতে বনবাসী সমাজের নবীন প্রজন্মকে উৎসাহ দিয়ে উন্নতমানের খেলোয়াড় তৈরি করার লক্ষ্যে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর তিনদিন পুরুলিয়া জেলার বরাভূম রেলস্টেশন সংলগ্ন রাঙাডি ফুটবল মাঠে সম্পন্ন হয় ২২ তম একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-১৮'। কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গের সাংগঠনিক ১৪টি জেলা থেকে উদীয়মান ২৫৯ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ১৩৭ জন পুরুষ ও ১২২ জন মহিলা।

তিনটি বিভাগে পুরুষ ও মহিলারা ১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০ মিটার দৌড়, লোহার বল নিক্ষেপ, দীর্ঘ লম্ফন, তিরন্দাজি ও ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করে। ম্যারাথনে পুরুষ বিভাগের ৩৮ জন ২১

কিলোমিটার এবং মহিলা বিভাগের ২২ জন ১৪ কিলোমিটার অতিক্রম করেন। প্রতিযোগীদের সঙ্গে থেকে নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন কল্যাণ আশ্রমের সংগঠন সম্পাদক মহাদেব গড়াই ও সহ সংগঠন সম্পাদক উত্তম মাহাতো। প্রতিযোগিতায় স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উদ্যোক্তারা জানান, সারা দেশে খেলোয়াড় তৈরির এরকম দু' হাজার প্রকল্প রয়েছে।

কলকাতায় গ্রেপ্তার মণিপুরের কমিউনিস্ট জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কলকাতা যে ক্রমশ অপরাধের স্বর্গভূমি হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ মিলল আরও একবার। গত ৮ সেপ্টেম্বর রাতে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এস টি এফ) গ্রেপ্তার করে মণিপুরের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কাঙলিপাক কমিউনিস্ট পার্টির স্বঘোষিত প্রধান আমন নেলসন সিংহ ওরফে চিঙখেই ঘুমানকে। মাত্র ২৮ বছর বয়সী এই নেতার থেকে উদ্ধার হয়েছে নাইন এম এম পিস্তল, দু'টো ৭ এম এম পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি সহ আরও কিছু আগ্নেয়াস্ত্র। মণিপুরে নাশকতামুলক কাজকর্মে মদত জোগানোর জন্য বেশ কয়েকবছর আগে কাঙলিপাক কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তারপরেও ওই কমিউনিস্ট দলের সদস্যরা বেনামে মণিপুরে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে প্ররোচনা দিচ্ছিল বলে অভিযোগ, এদের বিরুদ্ধে ওখানে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করতেই তারা কলকাতায় আশ্রয় নেয় বলে সূত্রের খবর। কলকাতাকে এরা তারপর থেকে 'সেফ প্যাসেজ' হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ ওঠে। মণিপুরী কমিউনিস্ট শীর্ষ জঙ্গি গ্রেপ্তারের পর এই প্রশ্নই উঠেছে, কলকাতার বুকে ডাকাতিতে তারা জড়িত বলেই এখানকার পুলিশের টনক নড়েছে, আগেই তারা সতর্ক হলো না কেন? সেইসঙ্গে এই আশঙ্কাও থাকছে কলকাতা শহরে বসে এধরনের আরও কত জঙ্গি এই শহরকে তাদের নিরাপদ আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করছে।

রাজীব হত্যাকারীদের মুক্তির প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাজীব গান্ধী হত্যায় সাজাপ্রাপ্ত সাতজন বন্দির মুক্তির আবেদন জানাবে তামিলনাড়ু সরকার। রবিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী ডি জয়াকুমার বলেছেন, এই মর্মে একটি প্রস্তাব রাজ্য মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয়েছে। এটি অবিলম্বে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল বনোয়ারিলাল পুরোহিতের কাছে পাঠানো হবে। রাজীব গান্ধীর হত্যায় সাজাপ্রাপ্ত এক বন্দি পেরারিভালান সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমাপ্রার্থনা করে আপিল করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যপালকে পেরারিভালামের আর্জি বিবেচনা করে দেখার জন্য পাঠায়। এর পরপরই তামিলনাড়ু সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করল। মৎস্যমন্ত্রী জয়াকুমার বলেন, রাজীব হত্যায় সাজাপ্রাপ্ত অন্য বন্দিরাও ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন করেছে। তাদের আবেদনও রাজ্যপালকে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ জানাবো। কেন্দ্র সরকার অবশ্য রাজীব হত্যায় অভিযুক্তের মুক্তির বিরোধিতা করছে। সেক্ষেত্রে, রাজ্যপাল কেন্দ্রের অসম্মতিতে এই আবেদন কি বিবেচনা করতে পারবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে জয়াকুমার বলেন, রাজ্যপালের সেই এক্তিয়ার আছে। এদিকে, কংগ্রেস ব্যতীত রাজ্যের অন্য বিরোধী দলগুলি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে। তামিলনাড়ুর ক্ষমতাসীন এ আই এ ডি এম কে দলের এই উদ্যোগের পিছনে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি কাজ করছে চলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে তামিল ভোটের দিকে তাকিয়েই এই প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এই তামিল ভোটের কথা ভেবেই অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শিক্ষক দিবসে শিক্ষক সমাজের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ শিক্ষক দিবসে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিক্ষক সমাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষকরা যে কেবলমাত্র অনুপ্রেরণা জোগান তাই নয়, তাঁরা শিক্ষাদান করেন এবং জ্ঞানের আলো ছড়ান। দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের উদ্দেশে এক ই-মেল বার্তায় প্রধানমন্ত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, শিক্ষকরা যে মূল্যবোধ শেখান, তা সারা জীবন তাদের সঙ্গে থেকে যায়।

প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আব্দুল কালামকে স্মরণ করে বলেন, ‘‘শিক্ষকতা অত্যন্ত মহান এক পেশা, যা একজন ব্যক্তি-মানুষের চরিত্র, দক্ষতা এবং ভবিষ্যৎ গড়ে দেয়।’’ তিনি বলেন, যেসব সমাজ শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়, তারাই একুশ শতকের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। বলাই বাহুল্য যে এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের উদ্দেশে তাঁর চিঠিতে আশা প্রকাশ করে বলেন যে, শিক্ষকরা প্রযুক্তির সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে নিজেদের অবহিত রাখছেন এবং প্রযুক্তির সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সংযোগ গড়ে তুলছেন। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কিছু উদ্যোগ যে নতুন পরিবর্তনের সূচনা করতে চলেছে, সে বিষয়েও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই শিক্ষাদান থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। ‘অটল টিঙ্কারিং ল্যাব’-এর মতো উদ্যোগের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা ভারত জুড়ে যেভাবে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে তাতে কোনও ছাত্রই উচ্চমানের শিক্ষার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে না।

২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী আয়োজনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বাপুর মহান আদর্শকে অভিনব উপায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার জন্য শিক্ষক সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। স্বচ্ছ ভারত মিশনকে সফল করার ক্ষেত্রে শিক্ষক সমাজ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের প্রশংসা করেন। ২০২২ সালে নতুন ভারতের স্বপ্নের কথা পুনরায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই সময় আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী মানুষদের স্বপ্নকে সফল করে তুলতে আগামী চার বছর নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে শিক্ষক সমাজকে।

সোনার মেয়ের পাশে কেন্দ্রীয় সরকার

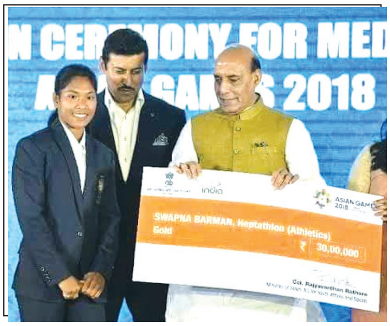

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অভিমান করেই কথাগুলো বলেছিলেন সদ্যসমাপ্ত জাকার্তা এশিয়াডে হেপটাথলনে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মণ। বলেছিলেন, দেশের অন্যান্য রাজ্য তাদের সফল ক্রীড়াবিদদের অনেক বেশি টাকা দিচ্ছে, তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ দিচ্ছে খুবই কম। দশ লক্ষ টাকা। স্বপ্নার অভিমান ভুলিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে সোনার মেয়ের হাতে তিরিশ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। সগর্বে ঘোষণা করেছেন স্বপ্নার মতো যেসব ক্রীড়াবিদ জাকার্তায় মুখ উজ্জ্বল করেছেন তাঁরা সকলেই দেশের গর্ব। এই ঘটনার পর স্বপ্না বর্মনের আর কোনও অভিমান নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বপ্না হেপটাথলনে সোনা জেতার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দশ লক্ষ টাকা দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। পুরস্কারের অঙ্ক শুনে স্বপ্না যেমন আহত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ক্রীড়াক্ষেত্রের নামী-দামি ব্যক্তিত্বরাও তাদের অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন। বেগতিক বুঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকার সঙ্গে স্বপ্না ও তার ভাইয়ের জন্য চাকরির প্রস্তাব দেন। এই মুহূর্তে স্বপ্নার টাকার খুবই প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। আপাতত চিকিৎসা এবং সংশ্লিষ্ট অস্ত্রোপচারের জন্যই অনেক টাকা লাগবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া আর্থিক পুরস্কার সেই প্রয়োজন অনেকটাই মেটাতে পারবে বলে স্বপ্না এবং তার প্রশিক্ষক মনে করছেন। স্বপ্না জানিয়েছেন শরীর একটু সেরে উঠলে তিনি আবার জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করবেন।

২০১৯-এর স্লোগান 'অজেয় ভারত, অটল বিজেপি'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি 'অজেয় ভারত, অটল বিজেপি' এই স্লোগান নিয়ে নির্বাচনে লড়তে নামবে। দিল্লিতে বিজেপির রাষ্ট্রীয় কার্যকরী সমিতির বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কার্যকরী সমিতির সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'অজেয় ভারত, অটল বিজেপি' স্লোগানের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন কার্যকরী সমিতির সদস্যদের সামনে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারত অপ্রতিরোধ্য, তাকে কোনো শক্তি রুখতে পারবে না। তেমনই বিজেপিও তার আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ। এই আদর্শ মেনেই বিজেপি চলবে।'

কার্যকরী সমিতির সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিজেপি যে বিকাশের নীতি নিয়েছে, তার সামনে পড়ে দিশাহারা হয়ে গিয়েছে বিরোধী দলগুলি। একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না যে বিরোধীরা, তারাও এখন বিজেপিকে ঠেকাতে জোট বেঁধেছে। এটাই বিজেপির সাফল্য। এই বিরোধীদের নেতৃত্বের কোনও ঠিক নেই, এদের নীতি অস্পষ্ট এবং কোনো দিশাও নেই এদের।' কংগ্রেসকে সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেসের দশা অত্যন্ত করুণ। ছোটো ছোটো দলগুলি মহাজোটের কথা বলছে, কিন্তু তারা কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে চাইছে না। কংগ্রেসকে মোটেই কেউ ভরসা করছে না। কাজেই ২০১৯-এর নির্বাচনে আমাদের কোনো ভয় নেই।' কার্যকরী সমিতির বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, কংগ্রেসের ৪৮ বছরের শাসনকালের তুলনায় তার ৪৮ মাসের শাসনকাল অনেকটাই ভালো। বিরোধীদের প্রতি কাজের নিরিখে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কার্যকরী সমিতির বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ দাবি করেন, ২০১৯-এ বিজেপি আরও অনেক বেশি আসন পেয়ে ফিরে আসবে। ২০১৯-এ বিজেপি এলে আগামী ৫০ বছর কেউ তাদের হারাতে পারবে না বলেও দাবি করেন বিজেপি সভাপতি।

অমিত শাহ বলেন, বিজেপির সামনে বিরোধীরা ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না। কারণ, বিরোধীদের কোনো নেতা নেই, নীতি নেই, রণকৌশলও নেই। বিজেপির এসবই আছে। পরে এ বিষয়ক একটি প্রস্তাবও জাতীয় কার্যকরী সমিতির বৈঠকে গৃহীত হয়।

জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়েও কার্যকরী সমিতির বৈঠকে বক্তব্য রাখেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। তিনি বলেন, এন আর সি-র প্রয়োজনীয়তা কী সেটা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে বোঝাতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, কে অনুপ্রবেশকারী আর কে-ই বা শরণার্থী। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ফলে দেশে কী কী সমস্যা হয়েছে, কী কী সমস্যা ভবিষ্যতে হতে পারে— তা সরল ভাষায় মানুষকে বোঝাতে হবে। এন আর সি নিয়ে বিরোধীরা যেভাবে মিথ্যা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে— তার মোকাবিলা করতে হবে। না হলে বিরোধীরা মিথ্যা প্রচার চালিয়েই যাবে।

পরে কার্যকরী সমিতির বৈঠকের বিষয়বস্তু সাংবাদিকদের জানাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেন, ২০২২ সালের ভিতর 'নয়া ভারত' গঠনের সংকল্প নিয়েছে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি। বিজেপির নেতৃত্বেই এই নয়া ভারত গড়ে উঠবে। সে বিশ্বাস দেশবাসীর আছে বলেও দাবি করেন জাভড়েকর।

সারা বিশ্বের হিন্দুরা এক হোন : মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হাজার বছর ধরে হিন্দুরা এক অবর্ণনীয় জীবনযন্ত্রণার সম্মুখীন। এর প্রধান কারণ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধগুলি থেকে সরে যাওয়া এবং হিন্দুত্বের মূল আদর্শ অধ্যাত্মবাদী সমাজজীবনের বিচ্যুতি। সম্প্রতি শিকাগোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু ধর্মসম্মেলনে একথা বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, 'আমাদের শিক্ষা আছে, প্রজ্ঞা আছে কিন্তু আমরা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারি না। হিন্দুদের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই। অভাব ঐক্যবদ্ধতার। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন একতার। সারা বিশ্বের হিন্দুরা এক হোন।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা ক্রীতদাস নই। আমাদের সমাজ পিছিয়ে পড়াও নয়। সঙ্ঘ সমাজের প্রতিটি স্তরে দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করছে। আমাদের কাছে কেউ অস্পৃশ্য নয়। আমাদের প্রতিটি কাজ আধ্যাত্মিক ভাবনার ফসল।' উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত ধর্মমহাসভার দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্মেলন মঞ্চে স্বামীজীকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

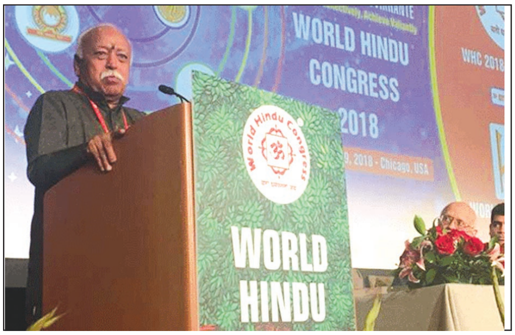

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৫

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী যুক্তানন্দ

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - অবেক্ষণ।। সুমিত্রা ঘোষ— কুসুম কুমারী
জিষ্ণু বসু—হাতি ঘোড়া পাল কী

উপন্যাসোপম কাহিনি

প্রবাল চক্রবর্তী - মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, শেখর বসু, সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী
গোপাল চক্রবর্তী, তাপস অধিকারী

ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— রেনেসাঁর ভূমিতে

জীবন-কথা

জহর মুখোপাধ্যায় - মশাল হাতে সিংহ পুরুষ

প্রবন্ধ

ডা: অমূল্যরতন ঘোষ, অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, জয় সেন, দেবীপ্রসাদ রায়, সারদা সরকার, সুদীপ বসু, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত কুশারী, সৌমেন নিয়োগী

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

সাপ্তাহিক রাশিফল

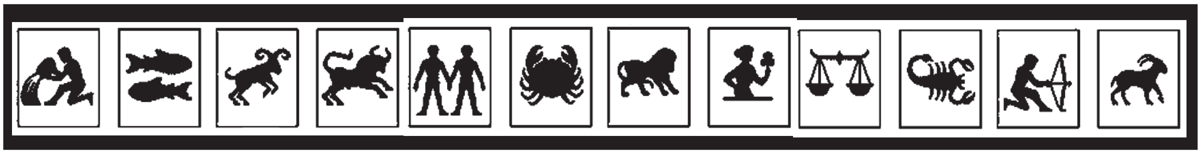

১৭ সেপ্টেম্বর (সোমবার) থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, সিংহে রবি-বুধ, তুলায় বৃহস্পতি-শুক্র, ধনুতে শনি, মকরে মঙ্গল-কেতু। বুধবার ভোর ৩-৩০ মিনিটে বুধ বার ভোর ৫টায় রবির কন্যায় প্রবেশ।

মেষ : কর্মে সাফল্য। সৃজনশীলতা, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য। পদোন্নতি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বা বাকচাতুর্যে প্রজ্ঞাবান, আস্থা ও সাধুবাদ প্রাপ্তি। বিলাসিতা, বাড়ি, গাড়ির জন্য ব্যয়। সপ্তাহের শেষভাগে স্ত্রীর শারীরিক ক্লেশ। দুর্জনদের থেকে দূরে থাকুন। নিকট ভ্রমণ।

বৃষ : গুরুজনের পরামর্শ ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। চিকিৎসক ও ক্রীড়াবিদের শুভ। কর্মক্ষেত্রে জটিলতার অবসানে চাপমুক্তি, পদচারণায় মানসিক প্রশান্তি। প্রতিবেশী ভাই-বোন, আত্মীয় সমাগমে সন্তুষ্টি। বন্ধুস্থানীয় কারও দ্বারা উপকৃত হবার সম্ভাবনা। লাইফ পার্টনারের কর্মসংস্থান যোগ।

মিথুন : কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে উদ্বিগ্নতা দেখা দেবে। অহেতুক ও ছিদ্রান্বেষী মনোভাব বর্জন করুন। সন্তানের মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি। পিতার পরামর্শ ও পিতৃবিত্ত প্রাপ্তির যোগ। সমাজ সহায়তা ও দয়ার্দ্রহৃদয়ের প্রকাশ, সপ্তাহের প্রান্তভাগে নানা অবসাদ, হতাশা ও নিম্নাঙ্গের পীড়া।

কর্কট : চিন্তাভাবনায় দোদুল্যমানতা পরিহার করুন। উপার্জন বিষয়ে বিকল্প পথের সন্ধান। চাকুরেদের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের প্রশংসা পেতে হবে। সপ্তাহের শেষভাগে মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগ ও কর্মসূত্রে প্রবাস। খনি ও পরিবহণ ব্যবসায় শুভ। রমণীর প্রতি সহানুভূতিশীল মন।

সিংহ : জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-দক্ষতার পূর্ণ মূল্যায়ন। বিদ্যা-ব্যবসায় প্রতিপত্তি ও ধর্ম-কর্মে সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। শিক্ষক, অধ্যাপক, বিচারক, সাহিত্যপিপাসুদের সৃষ্টির আনন্দ ও সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি। দান-ধ্যানে আত্মভোলা উদার দৃষ্টিভঙ্গি। বন্ধুদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা লাভ।

কন্যা : লক্ষ্মী ও সরস্বতীয় কৃপালাভার্থে বিদ্যা-ব্যবসায় মানবিক গুণের প্রকাশ। কবি, সাহিত্যিক, প্রকাশনায় সাফল্য ও বিলাসব্যসনে প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণ। দীর্ঘ অসুস্থতা থেকে মুক্তি ও অংশীদারি ব্যবসায় সফল বিনিয়োগ।

তুলা : কীট-পতঙ্গ ও সংক্রামক রোগ থেকে সতর্ক থাকুন। বিদ্যার্থীর অমনোযোগিতা ও ক্যালকুলেটিভ সেন্সের অভাব। পিতৃ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ও সংস্কারে ও শিল্পী, কলাকুশলী ও প্রযুক্তিবিদের কাঙ্ক্ষিত ফলপ্রাপ্তি। সৃজনশীলতায় সৃষ্টির আনন্দ ও প্রেমের প্রত্যাশা।

বৃশ্চিক : বিদ্যা, পদোন্নতি, মানবিকতা, রুচিসম্মত খাদ্য, পোশাক, উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ, বয়স্ক ও দুর্বল শ্রেণীর সহায়তা কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের সম্মান। সপ্তাহের প্রান্তভাগে পরিজন সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি ও মাতার স্বাস্থ্যহানি, পুত্র-সন্তানের চঞ্চল মানসিকতায়ও আধুনিকতার পরশ।

ধনু : আয়ের মতিগতি, শারীরিক ক্লেশ, তবে সন্তান লাভ হেতু আনন্দ। বিদ্যার্থীর মনঃসংযোগের অভাব ও স্মৃতিভ্রংশতা যোগ। দুর্ঘটনা-অস্ত্রোপচার ও সম্পত্তি বিষয়ক বিভ্রান্তি। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান লাভের ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। সপ্তাহের শেষভাগে ভালো বন্ধুর সংসর্গলাভ।

মকর : প্রতিবেশী ও স্বজন সম্পর্কের উন্নতি। শত্রুজয়ী তবে আলস্য-উদাসীনতায় কর্মে মনান্তর ও বিভ্রান্তি। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়। বন্ধু নির্ণয়ে সাবধানতা আবশ্যক। জলপথে ভ্রমণ যোগ। সন্তানের কারণে গর্ববোধ। পুরানো মামলা মোকদ্দমার ফল অনুকূলে আসতে পারে।

কুম্ভ : ন্যায়, সরলতা, পাণ্ডিত্য, গবেষণা, গুণীজন সান্নিধ্য লাভ। উচ্চপদস্থের সুআচরণ ও সমাজ হিতৈষণায় ভরপুর মন। আয়ের একাধিক সূত্রের সন্ধান। সফ্টওয়ার-হিসাবশাস্ত্র ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীর অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ, গুরুজনের পরামর্শে ভাগ্যোদয়, প্রমীলাবাহিনীর সংসর্গ এড়িয়ে চলুন।

মীন : প্রতিবেশীর সহায়তা, ভ্রাতা-ভগ্নীর কর্মসংস্থান, উপার্জনের নতুন দিশার সন্ধান। নীতি ও আদর্শে অবিচল থাকা ভালো সুহৃদ সম্পর্ক। প্রিয়জনের কোনও শুভ সংবাদ আনন্দের কারণ। সমাজ কল্যাণে যোগ্য ভূমিকায় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন সহ তীর্থদর্শন। ছোটোদের অন্যায় আবদার পরিহার করুন।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

শ্রী আচার্য্য